উত্তর ভাষা

• শীত সংখ্যা • ডিসেম্বর ২০১৬ • মূল্য ২০ টাকা

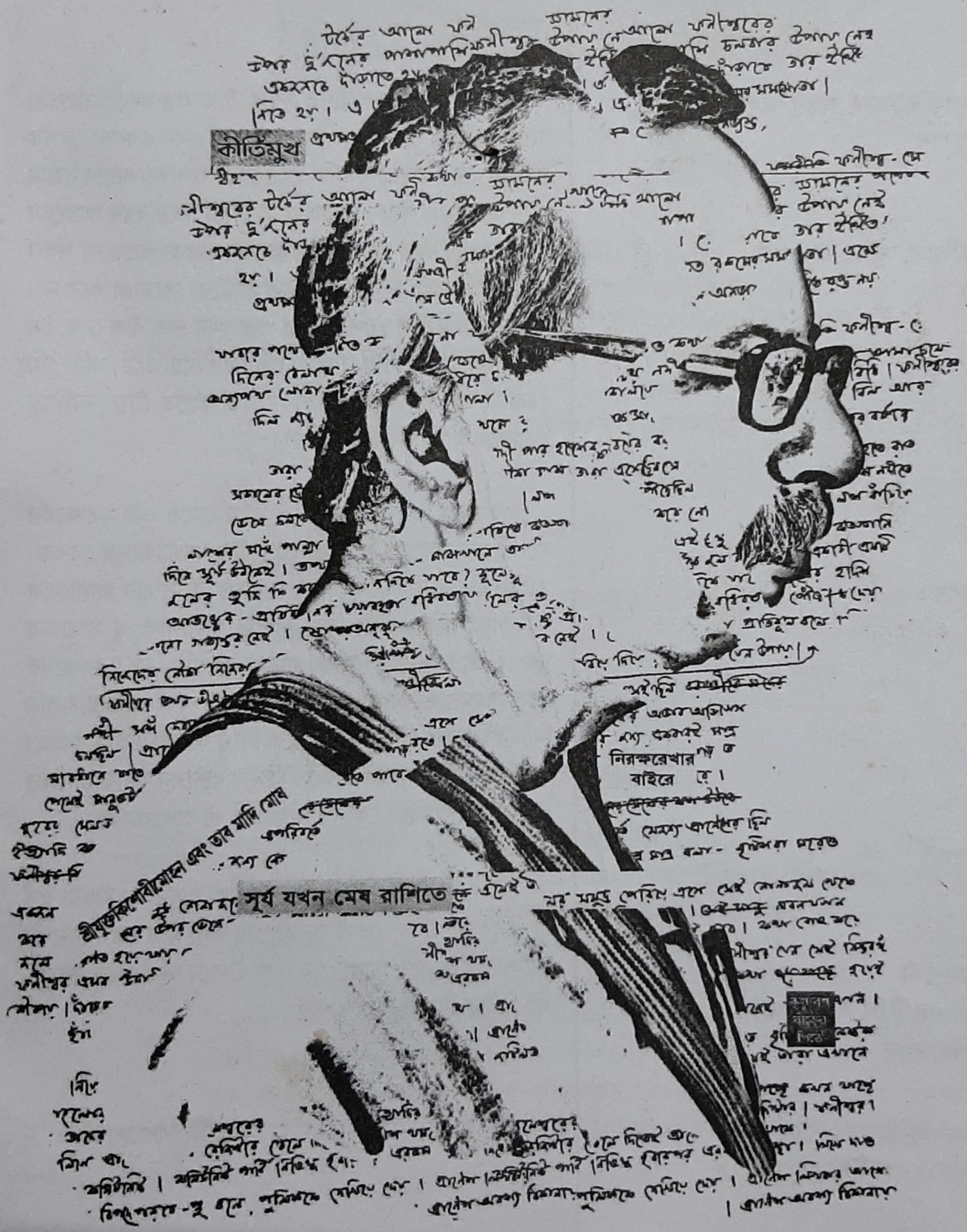

অন্তরঙ্গ পীযূষ

উত্তরভাষা
ষান্মাসিক বাংলা সাহিত্য পত্রিকা
নবম বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা ঃ ১৪২৩/২০১৬
ISSN 2349-2457
Uttarbhasha December 2016 Vol. 8, Issue-2

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি :
পীযূষ ভট্টাচার্য

সম্পাদকমণ্ডলী :
রিপন সরকার, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, অতনু গাঙ্গুলী,
প্রদীপ সাহা, সুরজ দাশ

সদস্য :
সঞ্জয় ঘোষ, বিপ্লব সাহা, সুপ্রিয় অধিকারী,
অভিজিৎ ভৌমিক

সম্পাদক :
কৌশিকরঞ্জন খাঁ

সহ সম্পাদক :
বরুণ তালুকদার

প্রচ্ছদ, বর্ণ সংস্থাপন :
গোপাল সরকার

প্রকাশক :
ব্রতীন সরকার

মুদ্রণ :
শংকর প্রেস, বালুরঘাট

সম্পাদকীয় দপ্তর :
প্রযত্নে - কৌশিকরঞ্জন খাঁ
নারায়ণপুর (এন.বি.এস.টি.সি. বাসস্ট্যান্ড)
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর
ডাক সূচক : ৭৩৩১০১
ই-মেল : uttarbhasha@gmail.com
চলভাষ : ৯৯৩২৯২১৮২৩, ৯৪৩৪৩০৫৫৭৯

মূল্য ঃ ২০ টাকা

সম্পাদকীয়

বাংলাভাষা ও ভাষাকর্মীদের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গতা সাতরঙা আলো ছড়িয়ে রেখেছে। পীযূষ ভট্টাচার্য এমন একজন লেখক যিনি এ যাবৎ গদ্যচর্চার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অন্যতর ধারার সন্ধান করে চলেছেন। পুরাণ থেকে কুটো ঠোঁটে নিয়ে বয়ন করেছেন বাবুই বাসা। তাঁর লেখায় একধরনের ভদ্রতা থাকে যা সরল নদীর মতো বয়ে চলে। এই স্রোত কাউকে তোয়াক্কা করে না। কখনও বিপদসীমা ছাপিয়ে তাঁর গদ্য যখন দ্রুত বাঁক নেয়, সে সময় নিরীহ আত্রেয়ীর মতো তা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। যদি তুমি ছেলে খেলা করো তবে চোরাস্রোত দহতে টেনে নামিয়ে তোমাকে খাবি খাওয়াতে পারে।

এই রকম একজন লেখককে নিয়ে মেতে ওঠা মহাকর্ষের মতোই চরম বাস্তব। তিনি মূলতঃ লিট্‌ল ম্যাগাজিনের লেখক। তাই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের গাল দেওয়ার বা সম্মান জানানোর অধিকার আছে। কেউ কেউ চাইলে গালাগাল বা সম্মাননা যুগপৎ দিতে পারেন। তাতে কারও আপত্তি নেই। বহুজনের মতো আমরাও তাঁর চর্চায় সামিল। হ্যা, বুক বাজিয়ে বলছি মিথের জাদুকর পীযূষ ভট্টাচার্যকে নিয়ে আমরা উল্লাস করছি। কারও কোনও আপত্তি থাকলে মার্জনা করবেন অথবা চ্যালেঞ্জ করবেন। মাঝামাঝি কোনও অবস্থানে পা রাখবেন না।

যে সমস্ত পত্র-পত্রিকার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হল না পীযূষ সম্পর্কিত লেখা পুনর্মুদ্রণের জন্য মাত্র যোগাযোগের জটিলতার কারণে, তারা যেন নিজ ঔদার্যে ক্ষমা করে দেন— এই বিনীত নিবেদনটুকু রাখছি।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

এক নজরে পীযূষ ভট্টাচার্য

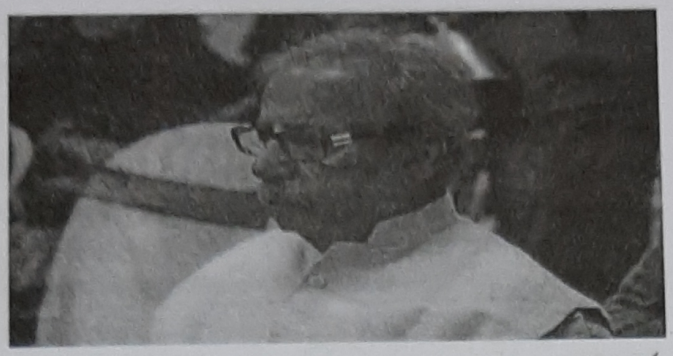

পীযূষ ভট্টাচার্য

জন্ম : ৩ ডিসেম্বর ১৯৪৬
জন্মস্থান : বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর (মামাবাড়ি)
শৈশব কেটেছে : কলকাতার চিৎপুরে, অধুনা বাংলাদেশের নীলফামারী এবং দার্জিলিং জেলার সোনাদায়, ১৯৫৮ থেকে বালুরঘাটে।
নিবাস : চকভবানী, পুলক নিয়োগী লেন, বালুরঘাট।
শিক্ষা : প্রাইভেটে বি.এ. পার্ট ওয়ান পর্যন্ত।
পেশা : পি.ডব্লিউ.ডি.-তে গ্রুপ 'ডি' থেকে শুরু করে করণিক হয়ে ২০০৬এ অবসর।
বিবাহ : ১৭ এপ্রিল ১৯৭০।
স্ত্রী : মাধুরী
সন্তান : দুই মেয়ে, যথাক্রমে পারমিতা ও সঙ্ঘমিত্রা
নাতনি-নাতি : ঐন্দ্রিলা ও ইমন
প্রথম গল্প : গরমভাত (প্রতিলিপি পত্রিকা, বালুরঘাট)
প্রথম গল্পগ্রন্থ : কুশপুত্তলিকা
উপন্যাস : জীবিসঞ্চার

সম্মাননা :-

১। 'মধ্যবর্তী' সাহিত্য পত্রিকার সংবর্ধনা (২০০২)
২। কবিতা পাক্ষিক পত্রিকার সম্মাননা
৩। বিশিষ্ট সাহিত্যিক সম্মাননা ও পুরস্কার - উত্তরবঙ্গ নাট্যজগৎ
৪। Award for distinguised service in the field of literature (2008)
৫। শান্তি সাহা স্মারক পুরস্কার - পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (২০১০)
৬। কবি জীবনানন্দ স্মারক সম্মান - এবং বিকল্প (২০১১)
(জীবিসঞ্চার উপন্যাসের জন্য)
৭। বিশিষ্ট সাহিত্য সম্মাননা - রুদ্রকাল (২০১৩)
৮। বিমলা বর্মন স্মৃতিস্মারক পুরস্কার - সংবেদন প্রদত্ত (২০১৫)
৯। বদরী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মান - কথাজাতক (২০১৫)
১০। রাধামোহন মোহান্ত স্মারক সম্মান - দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাব (২০১৫)

প্রকাশিত বই :-

কবিতা সংকলন :	মহিন্ন অসুখ মহিন্ন যন্ত্রণা	-	১৯৯১ একুশে, কলকাতা
গল্প সংকলন :	কুশপুত্তলিকা	-	১৯৯৫ রক্তকরবী, কলকাতা
	পীযুষ ভট্টাচার্যের গল্প	-	১৯৯৮ রক্তকরবী, কলকাতা
	কীর্তিমুখ	-	২০০১ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা
	পদযাত্রায় একজন	-	২০০৪ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা
	নির্বাচিত গল্প	-	২০০৪ দীপ প্রকাশন, কলকাতা
	ঠাকুমার তালপাখা ও অন্যান্য গল্প	-	২০০৬ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা
	শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন এবংতার মাদি মোষ	-	২০০৯ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা
	কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড়ের পিঠে জলের বর্গক্ষেত্র		২০১৩ চর্চাপদ, কলকাতা ২০১৬ সহজিয়া, কলকাতা
উপন্যাস :-	জীবিসঞ্চার	-	২০০১ রক্তকরবী, কলকাতা
	নিরক্ষরেখার বাইরে	-	২০০২ প্রমা, কলকাতা
	তালপাখার ঠাকুমা	-	২০১২ ভাষাবন্ধন, কলকাতা
	সূর্য যখন মেষ রাশিতে	-	২০১৩ ভাষাবন্ধন, কলকাতা

<u>প্রকাশিত গল্প অথচ এখনও গ্রন্থভুক্ত হয়নি</u>

গরমভাত (প্রথম প্রকাশিত গল্প, প্রতিলিপি, ১৯৮০)
বংশধর (অন্যদিন)
গবেষণা (অনুসন্ধানী চোখ)
বানপ্রস্থের মহাবিষুব (অন্যদিন)
কালুয়ার কাল্লু (সাতরঙ)
উদ্ধারপর্ব (অন্যদিন)
খরা (প্রতিলিপি)
ব্যাধি (অন্যদিন)
শশধর জাগুয়া (অন্যদিন)
প্রতিপক্ষ (বালুরঘাট বার্তা)
অনন্ত কাহিনী (মধুপর্ণী)
নদীর বন্যা (জনরোল)
সংক্ষেপে করুণাময় (অশোকবন)
শেষ রাতে ট্রেন (প্রতিলিপি)
সনাক্তকরণ (বর্তিকা)
ভাঙা শিলালিপি (উত্তরবঙ্গ সংবাদ)
দোনলা বন্দুক (দৈনিক বসুমতি)
অসুখ (আজকাল)
চল মিনি (প্রতিদিন)
নির্ধারিত দেড় মাস (প্রতিদিন)
বাতিল কর্মসূচি (অভিষেক)
বৃষ্টির রূপকথা (কালি ও কলম)
মধ্যদিন মধ্যরাত (একালের রক্তকরবী)
জার্সি গরুর রচনা (উত্তরভাষা)
সাফাই অভিযান (?)
ভগ্নাংশ (?)

বড়গল্প : উৎসর্গের উপকথা (একালের রক্তকরবী)

উপন্যাস : শূন্য ডিঙার নাম শঙ্খচূড় (মধ্যবর্তী)
(এই তালিকা অসম্পূর্ণ। প্রবন্ধ, কবিতা ও মেমোরিসের উল্লেখ এখানে নেই)

উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকার :-

১। অলোক গোস্বামী সম্পাদিত 'গল্পবিশ্ব' পত্রিকার (শিলিগুড়ি) আগষ্ট ২০০৭ সংখ্যায়
২। কৌশিকরঞ্জন খাঁ ও রক্তিম সাহা সম্পাদিত 'উত্তরভাষা' পত্রিকার (বালুরঘাট) মে ২০১৩ সংখ্যায়
৩। অশোকবন (বালুরঘাট), রূপান্তরের পথে (মালদা)

দশটি প্রশ্ন পীযূষ ভট্টাচার্যকে

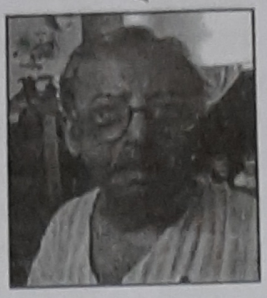

উত্তরভাষা : আজ আপনার নিজের শহরে আপনাকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে - কেমন লাগছে?

পীযূষ : এই পর্যন্ত যা লেখালেখি করতে পেরেছি তা নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন একটি অভিনব ব্যাপার এবং সম্মানের। যেহেতু আমার জন্মদিন, ৭০ বছরে পৌঁছে গেলাম দেখতে দেখতে। লেখালেখির বয়সও হয়ে গেল ৩৫ বছর। আজকে বলা যেতেই পারে কলকাতা থেকে দূরে এই শহরে থাকা সত্ত্বেও আমি একজন পেশাদার লেখক কিন্তু কোনও মতেই বাণিজ্যিক লেখক নই। বাণিজ্যিক লেখকদের মতন পটুত্ব আছে কি নেই সে প্রশ্নে না গিয়ে বলতে চাই চাহিদা মতন লিখি না। নিজের তাগিদেই লিখি। সেক্ষেত্রে আমার চাহিদা - কাগজ কলম, প্রস্তুতির জন্য চাই মুক্ত পরিসর আর খানিকটা স্বাধীনতা। চাকরি থেকে অবসরের পর লেখালেখির হোলটাইমার।

গোলগল্প লিখি না বলে দুর্বোধ্য বলা হত প্রথম দিকে। যখন বোঝা গেল এ ব্যাটা নাছোড়, এভাবেই লিখবে। তখন বলা হল ভিন্নধারার লেখক। কেউ কিন্তু উচ্চারণ করল না প্রকৃত ধারার কথা। কেননা ওটা ইউরোপীয় ঘরানার হাত ধরে এসেছে। জেনে বুঝে উপনিবেশের দাসত্বের কথা স্বীকার করা যায় না—তাই ভিন্নধারা। নিজে অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না বলে এখনও লিখছি যা মূলত আখ্যান আঙ্গিকের অনুসরণ।

কেমন লাগার প্রশ্নে একটাই কথা নিজের লেখালেখি বিশ্লেষণের সময় যেন থাকে লেখার সবদিকগুলো। বিশেষ করে ব্যর্থতার দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় যেন। কেননা এই শহরে আমার পরবর্তী প্রজন্মের কথাকার—সাহিত্য অনুরক্তরা এই আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। তারা জানুক। কেননা এভাবেই সাহিত্য বেঁচে থাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। সেজন্য তাদের জন্য রইল কুর্নিশ।

উত্তরভাষা : মানুষ জন্ম তো আপনার ৩ ডিসেম্বর ১৯৪৬। কিন্তু সেই মানুষটার মধ্যে লেখকজন্ম কীভাবে হল বলে আপনি মনে করেন—

পীযূষ : কিভাবে যে লেখক হয়ে গেলাম, তার জন্মই বা কীভাবে তার সঠিক উত্তর আমার কাছে এতদিন ছিল না। অন্যান্য ইন্টারভ্যুতে এই প্রসঙ্গে একেক রকম বলেছি। এখন মনে হয় কোনঠাসা অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে খুঁজতে লেখাকেই পেয়ে যাই। প্রথমে অবশ্য কবিতা লিখতাম। ধ্বনিভিত্তিক কবিতা। একসময় মনে হয় যে ধ্বনি তুলবার চেষ্টা করছি সুদূরে অনুরণন হচ্ছে না মাঝপথেই হারিয়ে যাচ্ছে কেননা তখন যাপন করতাম দুর্বিসহ এক জীবন। অবশ্য একটা চাকরি করতাম পূর্তবিভাগে গ্রুপ ডি পোস্টে। ট্রেড ইউনিয়ন করবার কারণে প্রায় ১২ বছর প্রমোশন বন্ধ। পরিবার পরিজনকে দেখভাল করবার জন্য কোক কয়লার কারখানায় পার্ট টাইম কাজ—সব মিলিয়ে আক্ষরিক অর্থে উদয়াস্ত পরিশ্রম। অবস্থাটা যেন সেই বিড়ালের মতন। অন্ধকার ঘরে খিল তুলে বন্দি। সামনে লাঠি হাতে হত্যা করতে উদ্যত বাস্তব। পরিত্রাণ পাবার জন্য রাত্রিতে ঝাঁপিয়ে পড়তাম লেখালেখিতে। বন্ধঘরে বিড়াল বাঘের মতন আক্রমণ করে এই বাগধারার অর্থ খুঁজে পেয়েছিলাম যেদিন সেদিনই বুঝি লেখক জন্ম হয়েছিল।

প্রথম গল্প লেখার চারবছর পর অর্থাৎ ১৯৮৪তে প্রমোশন হয়েছিল। পার্টটাইম কাজটা ছেড়ে দেবার পর সকাল সন্ধ্যায় নিজের মতন কাটাবার সুযোগ পেয়ে যাই।

আদপে এসব কথা বলতে চাইনা তথাপি বলে ফেললাম কেননা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তার একটা হিসেব এতদিনে হয়ে গেছে।

উত্তরভাষা : লিখতে এসে এতদিন পর মনে পড়ছে কোন বিশেষ মানুষ(দের) কথা যারা ছিলেন/আছেন বলেই এই লেখালেখি।

পীযূষ : একেক সময় মনে হয় অভিজিৎ সেন এখানে ছিলেন বলে লিখতে এসেছি। কেননা অভিজিৎ সেনের সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল পারিবারিক। এটা আংশিক সত্য। লেখালেখির প্রস্তুতিটা একেবারে নিজস্ব ব্যাপার স্যাপার। লেখাটা আমার মধ্যে ছিলই। কাউকে নিয়মিত লিখতে দেখলে ভিতরে ভিতরে তাগিদ অনুভব করা যায়। একে বড়জোর উসকে দেওয়া বলা যেতে পারে, কিন্তু কখনই সাহায্য নয়। ঠিকঠাক শব্দ অনুপ্রেরণা। কেউ আবার এই অনুপ্রেরণা খুঁজে পান উত্তরসূরিদের থেকে সেক্ষেত্রে লেখা রিমেক হবার সম্ভাবনা থাকে। আমি শুধু অনুসরণ করে চলছি এই অঞ্চলের ঐতিহ্যকে। মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার সমসাময়িক বাণগড়, পালযুগ, বৌদ্ধ ও মুসলিম পিরিয়ড, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে তেভাগা, এমনকি ১৯৪৬ এর আন্দোলনের ইতিহাস। লুপ্ত জনপদ, তখনকার মানুষজনের একজন অনুসরণকারী মাত্র। এর সঙ্গে আছে বর্তমানের চতুর্দিকে থাকা জীবনগুলিও। মৃতদের সঙ্গে আছে জীবিতরা সেজন্য আমার লেখা হয়ে উঠতে চায় পিতৃপক্ষের শেষে মহালয়ার মতন এক তর্পণ—যাঁরা অতীতের বান্ধব, অনাত্মীয়, যাঁরা পূর্বজন্মে বান্ধব ছিল, তারা আমার দেওয়া জলে তৃপ্ত হোক। সেজন্যই উগ্র প্রগতিশীলতার কথা লেখাতে থাকে না।

উত্তরভাষা : আপনার কোনও গল্প নিয়ে একটাও নাটক হল না, বিশেষত আপনি নাটকের শহরে থাকেন—এ নিয়ে কোনও পরিতাপ?

পীযূষ : প্রথমেই বলে রাখা ভালো, নাট্যসাহিত্য আমি পড়ি। কিন্তু নাটক মঞ্চস্থ করা একটি ভিন্ন প্রক্রিয়া, সেখানে নাট্যকার বা পরিচালকই মুখ্য। একাঙ্ক নাটকের জনক মন্মথ রায় এখানে ছিলেন। তাকে নিয়ে কতটুকু চর্চা হয়ে থাকে। এখানকার সাহিত্যের গবেষকরা মন্মথ রায়ের উপর গবেষণা পর্যন্ত করেন না—সেক্ষেত্রে নিজের গল্প নিয়ে নাটক করার কথা আমি চিন্তাতে আনতে পারছি না। আবার এও হতে পারে আমার গল্পে নাটকীয়তা নেই। গল্প উপন্যাসে নাটকীয়তা থাকতেই হবে তার তো কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। সেজন্য কোনও পরিতাপ নেই। তবে আমি ঘোর বিরোধী যারা বলে থাকেন 'সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালি' তাদের প্রতি। কেননা ওটা বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি, চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

উত্তরভাষা : এখন তো প্রচুর ই-ম্যাগাজিন বের হচ্ছে। আপনি মূলত লিট্‌ল ম্যাগাজিনের লেখক। আগামী দিন কার ই-ম্যাগাজিন না লিট্‌ল ম্যাগাজিনের?

পীযূষ : প্রযুক্তির অগ্রগতিকে ঠেকানো যায় না। যেমন অটোমেশন ঠেকানো যায়নি। এর ফলে শিল্পে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। ইনফরমেশন টেকনোলজি কম্পিউটারের দৌলতে এখন হাতের মুঠোতে। তথাপি ই-ম্যাগাজিন না পসন্দ। যে জিনিস সহজলভ্য তার প্রতি আগ্রহ বরাবরই কম, ই-ম্যাগাজিনে এপিক বা ক্লাসিক লেখা বেমানান। প্রিন্টেড বই-এর পড়বার অনুভূতি অন্যরকম। লাইন বিটুইন যাওয়া যায় এমনকি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মনোনিবেশ করা চলে। সেই অর্থে ই-ম্যাগাজিন পড়িনা বা দেখিনা বলে কোনও রকম আগ্রহ গড়ে ওঠেনি। প্রিন্টেড বইএর প্রতি আগ্রহই বেশি। মনে হয় এখানেই লেখক ও পাঠকের মধ্যে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে।

মূলত নয়, আমি লিট্‌ল ম্যাগাজিনেরই লেখক এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কালে ভাদ্রে যদি বাণিজ্যিক ম্যাগাজিনে লিখতে হয় তখন লিট্‌ল ম্যাগাজিনের লেখাটিই লিখি। কাগজের চাহিদা অনুযায়ী লিখি না।

উত্তরভাষা : একসময়ে আপনি কবিতা লিখেছেন। এখন মূলত গদ্যকার। কিন্তু আপনি জানেন কিভাবে গদ্য থেকে কবিতায় চলে যেতে হয়—আপনার গদ্যে তা আমরা পাই। সেটাকে আপনি দুর্বলতা না শক্তি হিসেবে দেখছেন?

পীযূষ : কবিতার একটি মাত্র সংকলন 'মহিন্ন অসুখ যন্ত্রণা' ১৯৯২ তে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই অর্থে কবিতা এখন ঠিক আসেও না। কিন্তু যেভাবে গদ্যটা লিখি তা যেন কবিতাকে স্পর্শ করে থাকে সবসময়। এ হচ্ছে ভারতীয় বাঙালির ঐতিহ্যানুসারে কাব্য গীতিময়তার গদ্য। কেননা আমাদের সাহিত্যের শুরুটাই কবিতা দিয়ে। কেননা সেই সময়ে গদ্য লিখবার চল ছিল না। কেউ তাগিদও অনুভব করেননি। প্রয়োজনে পয়ার ছন্দে গদ্যভাব এনেছেন। পর্তুগিজদের বাইবেল বা কেরী সাহেবের গদ্য নিয়ে আমার একটা কাজ আছে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। কিছু অপেরার কথা ছাড় দিলে ইউরোপে কিন্তু আগে গদ্য পরে কাব্যের শুরু।

নিজস্ব ঐতিহ্যকে অনুসরণ করাকে যদি দুর্বলতা বলে কেউ ধরে নেয় আমার কিছু করবার নেই। বাংলা সাহিত্যে কবিতার মধ্যে যে শক্তি ছিল তা আমার গদ্যে ফিরিয়ে আনবার প্রয়াস মাত্র।

উত্তরভাষা : আপনি কি মনে করেন—আপনার লেখা কালজয়ী?

পীযূষ : 'মারা যাবার পরও লেখক হিসেবে বেঁচে থাকতে চাই' একথা আগের সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম। উত্তর ছিল 'আকাঙ্ক্ষা'র প্রশ্নে। 'কালজয়ী' প্রশ্নের উত্তরে একটা কথাই বলতে চাই-'মহাকালই জানে'।

উত্তরভাষা : সাহিত্যজগৎ-এ দীর্ঘদিন আছেন। অনেক বন্ধু ইতোমধ্যেই হারিয়েছেন। কার জন্য খুবই কষ্ট হয়?

পীযূষ : অমিয়ভূষণ মজুমদারের চলে যাওয়াটার অনুভূতি ছিল, অভিভাবকশূন্য হয়ে যাওয়ার। কিন্তু এখানকার বাচ্চুদা (জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়), সঞ্জয় দত্ত'র চলে যাওয়াটাকে ব্যক্তিগত ক্ষতি হিসেবে মনে হয়। অজিতেশ ভট্টাচার্যকে যেমন খুউবই মিস কবি। রতন দাসের চলে যাওয়াটা রীতিমতন আত্মীয় বিয়োগ।

নবারুণের চলে যাওয়াটা এখনও মেনে নিতে পারিনি। বন্ধুত্বটা জমে উঠেছিল রীতিমতন প্রাপ্তবয়স্কে। ও যখন নিজেই বুঝতে পারছে এবারে যেতেই হবে তখন পাশাপাশি নির্বাক হয়ে বসে থাকতে থাকতে বলে উঠেছিল—তোর একটা লাইন আছেনা 'মৃত্যুকে মেনে নিতে হয়....' আবার নির্বাক।

যে কোনও নির্বাক মুহূর্তে নবারুণের কথা মনে পড়ে।

উত্তরভাষা : আপনার শহর আপনাকে ও আপনার গদ্যচর্চাকে কুর্নিশ জানিয়েছে। এই শহরে গদ্য ও পদ্যচর্চার সম্ভাবনা কেমন বলে আপনি ভাবছেন?

পীযূষ : যাঁরা কুর্নিশ জানিয়েছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ। জীবদ্দশায় একথা জানতে পেরে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ হয়ে গেলাম। লেখালেখিতে বালুরঘাট বা এই অঞ্চলের যে নিজস্বতা আছে তাকে অনুভবে আনতে হবে। যা আমার ভাষায় কুহককেন্দ্রিক। শোনা যায় মনসামঙ্গল রচয়িতা বিজয় গুপ্ত এই অঞ্চলেরই মানুষ ছিলেন। তাঁর মনসামঙ্গলে অলৌকিক তত্ত্ব বিন্দুমাত্র নেই, যা আছে তা হচ্ছে এক মানবিক বিকাশ। যা আমি পছন্দ করি। তা কবিতাতেও আসুক। কবিতা হয়ে উঠুক সৎ উচ্চারণের আধার। কবিতায় একটু ছন্দ থাকুক, পড়লেই যেন অনুভূত হয় মন্ত্র উচ্চারণের।

গদ্যকেও হয়ে উঠতে হবে বস্তুনিষ্ঠ। ছায়ার মতন জীবনকে অনুসরণ করে যাওয়া। গদ্যকারকে থাকতে হবে একটু তফাতে কেননা তার সৃষ্ট চরিত্রটি নিজের মতন ধরা দিক সময়ের কাছে। কেননা সত্য উদ্‌ঘাটন ছাড়া লেখকের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।

সর্বগ্রাসী এক উগ্র আধুনিকতার ঝোঁক আমাকে পীড়িত করে, যেখানে বসেই লেখালেখি করা হোক না কেন শেষ পর্যন্ত লেখাটা আন্তর্জাতিক স্তরেই পৌঁছে যাবার সম্ভাবনা থাকে সবসময়। আমাদের সেই সম্ভাবনাটাকে তৈরি করাটাই একমাত্র কাজ।

অনুপস্থিতির শিল্প

দেবেশ রায়

পাঠক হিসেবে প্রবীণতা দাবি করতে পারি। কবে যে পড়তাম না, ভুলে গেছি। মফস্বলের ছেলে বলেই হয়ত এমন অভ্যেস তৈরি হতে পেরেছে। যার কিছুই করার নেই সে অন্তত বই পড়তে পারে। আমি কোনও দিন পুতুলও খেলিনি। পড়া ছাড়া আমার কোনও গতি ছিল না।

যাঁরা কুকুর পোষেন, তাঁদের কাছে শুনেছি, বাড়ির সকলের শরীরে কুকুরের গায়ের গন্ধ গোপনে ছড়িয়ে থাকে। সে গন্ধ কোনও মানুষ পান না কিন্তু আর একটা কুকুর ঠিক পায়। সেই গন্ধ পেয়ে গেলে কুকুর আর তাকে আক্রমণ করে না।

বছরের পর বছর শুধুই পড়ে গেলে হয়ত কুকুরের মতো অলৌকিক ঘ্রাণক্ষমতা তৈরি হয়। এক ঝলকেই গন্ধ আসে, কোনও একটি লেখা আমার খাদ্য কি না, বা রাস্তায় শুয়ে থাকলেও ধেয়ে আসা ট্রাক থেকে বাঁচার চেষ্টা নেই, অথচ যে দোকানের আশপাশে অষ্টপ্রহর ঘোরাঘুরি তার বাচ্চা ছেলেটির ধমকেই কেঁউ কেঁউ করে পালিয়ে যাওয়ার দিব্বি ন্যাকামি আছে।

পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে সে ভাবেই গন্ধ পেয়েছিলাম। পীযূষের লেখাটাই তেমন, গন্ধ পেলে তো পেলে, না পেলে পেলে না। গল্পে পীযূষ নিজের কোনও বাজখাঁই উপস্থিতি তৈরি করেন না। ভয়ঙ্কর ঘটনা অনেক সময় থাকতে পারে—কিন্তু পীযূষের গল্পে তেমন ভয়ঙ্করতা ঘটে না। কখনও স্মৃতিতে, কখনও ভাবনায়, সেই ভয়ঙ্করের ওপর মিহি কুয়াশা ছড়িয়ে থাকে। এটা যদি দুটো-একটা গল্পেই ঘটত, তা হলে এই গুণটিকে তার কুশলতা মনে হতে পারত। এমন কুশলতাও ঈর্ষণীয়। পীযূষ তেমন কুশলতার চাইতে বড় লেখক।

আমার কথাটার উদাহরণ হিসেবে নয়, কথাটা নিজেই স্পষ্ট বুঝে নিতে পীযূষের গল্পের এই মিহি কুয়াশার বুনট দুটো-একটা পরীক্ষা করা যায়। 'কিন্তু আর এক সংলাপের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি ভোরের অপেক্ষায় থাকতে হত! তা না হলে এই আতঙ্কগ্রস্ত নীরবতা প্রাকৃতিক মনে হয়ে যেত এতদিনে।' (বোধনপর্ব)

এটা এই গল্পটির শুরু। গল্পটি তারপর গঠন পায় বেশিরভাগই কথনে, ঘটনায় নয়। বামুনবাড়ির ছেলে কমিউনিস্ট হয়েছে, এখন মন্ত্রীও হয়েছে। তার ভোটারদের তারই ভোটার রাখতে যে সব স্থানিক ব্যবহার, সরবতা ও নীরবতা দরকার, সেই সবই তার আয়ত্তে। শুকিয়ে যাওয়া নদী আত্রেয়ীর চরে নতুন সেচপ্রকল্প চালু ও অচালু করার সূত্রে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি, সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ, গেজেটিয়ারে আত্রেয়ীর জলপ্রবাহ নিয়ে সেই শ-দুই বছর আগের সংকট-এ সব এসেছে। কিন্তু এই ইতিহাস ও বাস্তব গিয়ে মিশেছে ঐ জায়গার এক রাজবংশী মোখা নর্তকের গল্পের সঙ্গে। সেই এককালের মোখা নর্তক, মোখার পোশাকে চৌদ্দ হাত কালীকে আরও প্রায় সাড়ে ছ-ফুট বাড়িয়ে অলৌকিকতা-রচনাকার। একদিনের।

পীযূষের গল্পটা এখানে আমি বলে দিতে চাইছি না। আমি শুধু জানাতে চাই—গন্ধটা পেয়েছিলাম কেন। এ গল্পটিতে খুব পরিষ্কার তিনটি বিভাজন আছে। সেই একটি কোনও বিভাজন নিয়ে বেশ ভাল একটি ছ-ঘন্টা আট-ঘন্টার ছোট উপন্যাস হতে পারত। একটি বিভাজন আত্রেয়ীর ইতিহাস ও বর্তমান। আর এক বিভাজন—সত্যসুন্দর ও বিকাশের একই রাজনীতির অন্তর্গত থেকে বিপরীতমুখী যাত্রা। আর একটি বিভাজন সেই রাজবংশী মোখা নর্তক বাঙ্কাকে নিয়ে। এমন আখ্যান নিয়ে আজকাল উপন্যাস লেখা হচ্ছে ও তার ফলে বাংলা গল্প-উপন্যাসের বিস্তার ঘটছে। এমনকী, মুখ্যত এই তিনটি বিভাজন ও আরও উপবিভাজন ঘটিয়ে একটি অখণ্ড উপন্যাসও তৈরি হতে পারত। তেমন উপন্যাসও লেখা হচ্ছে। আকারে বড় উপন্যাস লেখার তাকতই আলাদা।

গল্প-উপন্যাসের প্রচলনকে এড়িয়ে ও প্রত্যক্ষ তাকতের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পীযূষ গল্পটাকে নিয়ে গেল সেই মোখা নর্তকের দিকে। লোকমেলায় সে এসেছে তার প্রাচীন সেই নাচের ছবি টাঙানো থাকবে—শুনে। 'হাতড়াতে হাতড়াতে সে তার নিজের কাছে-এ ছবি বাংকার।'

বহুৎ খুব! রূপক যে এমন অনায়াসে তৈরি হয়ে গেল সে শুধু পীযূষের অনুপস্থির শিল্পে।

এর গন্ধ যদি না চিনে থাকতাম, তাহলে তো পাঠকের অহংকার থাকত কোথায়?

সৌজন্য- গল্পবিশ্ব

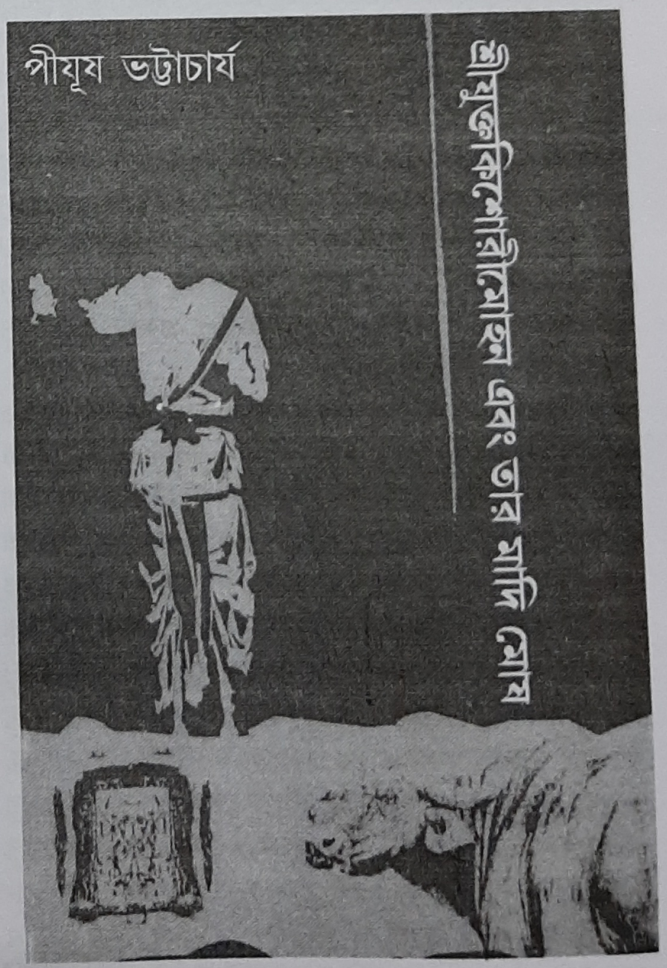

দৃশ্যমান অন্তরাল

সুধীর চক্রবর্তী

আধুনিকোত্তর কালে বিশ্বের সব চেতনাসম্পন্ন দেশেই সাহিত্যের ধারা ও অভিমুখ খাত বদল করেছে। লেখকদের কাজ আর 'যেমন দেখি তেমন লিখি' কিংবা ভাবী স্বপ্নের কল্পিত আখ্যানে আটকে থাকে না। লেখক হয়ে ওঠেন একজন আর্ত মানুষ, যিনি সময়হারা হয়েও সময়চিহ্নিত। অথচ ঠিক কালের পুতুল নন। এমনকী পাঠকদের বিনোদনকল্পে তাঁর লেখনী ধারণ নয় তাই প্রত্যাশিত ছকে বৃত্তধর্মী গল্প লিখে তাঁদের ইচ্ছাপূরণের চেয়ে লেখক চাইছেন নিজেকে জানতে। নিজের পরিচিত পরিবেশে, দেশ কাল মানুষ মাটির সংযোগে, আবার একই সঙ্গে তার থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে স্বদৃষ্ট কোনও চেতনালোকে বা জাদুবিশ্বে। আখ্যানের ভাষা তাই প্রবহমান ভাষার সমান্তরালে তৈরি করে এক আপন বয়ান, যাতে অতীতের সঙ্গে বর্তমান ছুঁয়ে ভবিষ্যতের সঙ্গে ঊর্ধ্বাধঃ সম্পর্কসম্পন্ন এক আবছা ভাষা গড়ে ওঠে, যার তত কিছু দায় নেই পাঠকের বোধগম্য হবার। এক্ষেত্রে লেখক বরং পাঠককে ভাবেন কিছুটা মেধাবী ও পরবাস্তবতার সন্ধানীরূপে। তাই পদে পদে তাঁকে যুক্তিক্রম, নিটোল গল্পবোনা, চরিত্রের বিকাশ বা নিসর্গ বর্ণনার বদলে নজর রাখতে হয় আত্মতার দিকে বা আত্মনির্মাণের দিকে। কমলকুমার মজুমদার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বা সুবিমল মিশ্রদের পড়তে পাঠকদের পক্ষ থেকে একটা আলাদা প্রস্তুতি লাগে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর জীবিতকালে নিজের মতো করে বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস লিখে বাক্সবন্দি করে রেখেছিলেন, ছাপেননি। বোধহয় বুঝেছিলেন সেই সময়ে তাঁর রচনারীতি বা রচনার বিষয় অনুধাবন করবার মতো পাঠকবৃত্ত প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি। পরে, তাঁর প্রয়াণের বেশ ক'বছর পরে, আবিষ্কৃত হয় তাঁর ঐসব স্বেচ্ছা অন্তরিত রচনা, যা পরবর্তী সময়ের পাঠক (সকলে নয়, কেউ কেউ) খুঁজে খুঁজে পড়ছেন, খুঁড়ে খুঁড়ে যেন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠছে অন্যরকম আলোকসম্পাতের মহিমা-অন্তর্বিশ্ব। আমাদের গল্প কথনের একটা অন্য রকম গহন রূপ যেন এবারে প্রতিভাত হচ্ছে—যা অনচ্ছ অথচ দুরূহের দারুণ আকর্ষণে প্রচ্ছন্ন টানে আমাদের ভাসায় ও ভাবায়।

পীযূষ ভট্টাচার্য গল্প লেখক রূপে খুব যে বিজ্ঞাপিত বা আলোচিত নন, সে তো সবাই জানেন। তাঁর বইগুলিও সুপ্রাপ্য নয়। থাকেনও অভিমানী দূরত্বে সেই বালুরঘাটের উত্তরাস্যাং দিশি। কিন্তু আমার মতো জাগ্রত পাঠক, খানিকটা যেন শিক্ষিত হবার ঝোঁকে, তাঁকে পড়তে থাকি, পড়তেই থাকি, ঘোরের মধ্যে। অথচ জানি পীযূষের গল্পে কোনও বস্তুগত টান নেই, চরিত্রগুলির পরম্পরা ধূসর, পরিণতিহীন সম্পর্কের কিংবা মগ্ন মানবের কিছু উদ্ভাস শেষ পর্যন্ত পাঠকের জন্য বরাদ্দ। তাই সই, বুঝতে পারি ব্যতিক্রমী এই লেখক নিজের জন্যই গল্প লেখেন, নিজেকেই বুঝতে খণ্ড সত্তায়। কিন্তু পাঠকদের জন্য রাখেন এক পরিসর, ভাবনার পরিসর—যা পাঠককে এগিয়ে দেবে লেখকের লক্ষ্যের অভিমুখে। শুরু হবে এক নতুন ডিসকোর্স, নতুন ভাষায় ও চিহ্নকের দৌত্যে। গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা বিধৌত বঙ্গ সাহিত্যে আত্রাই-পুনর্ভবা-টাঙ্গন যেমন নবধারা জলের বর্ণগন্ধে নতুন, পীযূষের গল্পের অবস্থান তেমনই নিসর্গ সম্ভব, অপিচ ইতিহাসের স্মৃতিগন্ধা আর লোকায়তের স্বেদজ স্বপ্নে আকীর্ণ। তাঁর বর্ণনায় আকাশ কলকাতার মতো লম্বা, টৌকো, নানা কিসিমের ফ্রেম বাঁধানো নয়—বিরাট আকাশ খোলা। তেমনই তাঁর অনুভবে তিনটি নদীর ত্রিবেণী রূপসা। তার যেমন চলে যাওয়া আছে, মজে যাওয়া আছে। সেই সঙ্গে আছে উত্তরবঙ্গের নিজস্ব ঋতুবদলের পবিত্রমূর্তি। পীযূষের বর্ণনায়—'তরাইয়ের মেঘ গলিত ধাতুর মতো সগর্জন নেমে প্রতিমা ছাঁচে স্বর্ণমূর্তি হয়ে যায় হেমন্ত। পর্ণমোচী বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়তেই মনে হয়, পরিযায়ী পাখিদের আসবার সময় হয়ে গেছে।...লেখাও এভাবেই হয়। এভাবেই পৌঁছাতে চাই শিকড়ে। সব জীবনই তো দুঃখের। ভালোবাসাও দুঃখেরই। বলা যেতে পারে এ সত্যিকারের বেঁচে থাকার দুঃখ। পরজন্ম নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। কেননা এজন্মেই তো বার বার করে জন্ম নিতে হচ্ছে।'

জীবনানন্দ দাশ কবিতায় পরাআধুনিকতার বয়ানে আশ্চর্য সব পংক্তি লিখে গেছেন, যেমন 'আকাশের ওপারে আকাশ'। তার মানে দৃশ্যের বাইরে পাঠকস্রষ্টার মানসলোকে ভাবা এক অদৃশ্য আকাশ—হয়ত স্রষ্টা নিজেও তা ভাবেননি, কবি তাঁকে ভাবালেন এই প্রথম। শিক্ষিত শহরবাসী চোখখোলা মানুষ যা বোঝেন না, গ্রামের লোক তা বোঝেন, কারণ জীবন তাঁদের প্রত্যক্ষ স্পর্শাতুর সান্নিধ্যে কবোষ্ণ। 'তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে এলো পল্লীর কাছে রে'—এ বর্ণনা রবীন্দ্রনাথেরই লেখা, তবে জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রনাথ নন, পদ্মা ঘোরা নদী দেখা এই রবীন্দ্রনাথ। গ্রামের লোক একবার আমাকে বলেছিলেন, 'জল এবারে যে পর্যন্ত এসেছে ঠিক আছে, তবে সামনে পূর্ণিমে, সেই সঙ্গে যদি ওপর বৃষ্টি হয় তবে ব্যানবন্যা ঠেকানো যাবে না'। এখানে 'ওপর বৃষ্টি' মানে কোনও অদৃশ্য মেঘপুঞ্জের ক্ষরণ—আকাশের ও পারের আকাশ থেকে। জীবনানন্দের এরকম এক উক্তি হল : 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়'। এরই পিঠোপিঠি কথা হল : 'আমরা যাইনি মরে আজও—তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়'। তার মানে বেঁচেই আছি এবং / অথচ আমাদের অদৃশ্যে তৈরি হচ্ছে কতই না দৃশ্য। সে দৃশ্য অবশ্য মূলত অদৃশ্য।

এ ধরনের ধরতাই না করলে পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পের সূচনাবিন্দু ধরা যাবে না। যেমন ধরা যাক তাঁর 'ক্ষরণ' গল্পের প্রথম ক'টি পংক্তি:

> রঙ জ্বলে যাবার আশংকায় রীতা শাড়িটি ছাদের একপাশের ছায়ায় মেলে। গত রাতে চাঁদের চারিদিকে পুকুর দেখে সে ঠিক আঁচ করতে পেরেছিল, আজ রোদ হবে। হাতের আড় ভেঙে মেঘের গতিবিধি লক্ষ করে রীতা যখন শাড়িটির দিকে তাকিয়ে দেখে, শাড়ির রঙ নকশায় কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়, কেননা রোদ্দুরের ভারে অবনত আকাশ নেমে এসেছিল চোখে।

এখানে রোদ, ছায়া, চাঁদের চারপাশের পুকুর, মেঘের গতিবিধি সবই নিসর্গের অংশ, তবে প্রাকৃতিক অর্থে নয়, মনের মানসে নির্মিত বয়ান। যে দেখেছে সে দৃশ্যত রীতা, অন্তরালে লেখকই দ্রষ্টা। পাঠককে

তাই সাবধানে পা ফেলতে হবে পীযূষের আখ্যানের জগতে পৌঁছতে, আসলে যা গল্পহীন কিন্তু অনুভূতিদেশের আলোয় অন্তর্দীপ্ত।

লেখকের চতুর কলম যেমন সাঁটে কথা বলতে জানে তেমনই মায়া রোদ্দুরের পরিশীলিত ভাষা তার মধ্যে রঙের পরশ আনে। 'পটগাধা' নামের গল্প শুরু হচ্ছে :

> হঠাৎ একটি পাখি ডেকে উঠলে নিসর্গবোধ তৈরি হয় না—একটু অন্যরকম লাগে। এই অন্য রকম লাগা নিয়েই এই গল্প।

'কোরবানী' গল্পের ধরতাই :

> মৃত্যুর মুহূর্তে পৌঁছে যেন জীবন জীবন হয়ে উঠেছে। মৃত্যুকে তো বোঝা যায় না। মেনে নিতে হয়।

'নির্বাচিত গল্প' (প্রকাশক : দীপ প্রকাশন) সংকলনের 'ভূমিকার পরিবর্তে' অংশে লেখকের জবানীতে জানা যাচ্ছে, ১৯৪৬-এ তাঁর জন্ম বালুরঘাটে, মামার বাড়িতে। কলকাতার চিৎপুরের থ্রি বাই এফ ব্রজকুমার শেঠ লেন থেকে দেশের বাড়ি রংপুর নীলফামারি, সেও এক উত্তরবঙ্গে, চলে আসতে হয়েছিল। সেখান থেকে বালুরঘাট। জায়গাটি কেমন? পীযূষ তাঁর নিজস্ব ঢঙে জানিয়েছেন : 'সে এক অন্য দেশ, তামাক পাতার ওপর জল শিশিরের আয়নাতে মুখ দেখা, নাম লিখে রাখা।'

ব্যস। পাঠক বুঝে ফেলবেন লেখককে, নাকি কথককে? বুঝবেন যে, এর চেতনা পরিপার্শ্ব আর ভাবনায় কোথাও গাঙ্গেয় স্পর্শ নেই, নেই বঙ্গীয় লেখককুলের অনপনেয় কলকাতা মুখিনতা। সেটা স্বস্তির কথা। নীলফামারি আর বালুরঘাটে লালিত একজন সংবেদী কথাকার তাঁর মতো বোধভাষ্য রচনা করে যে সব আখ্যান সামনে এনেছেন তার অন্তঃপটে অনেক ভিন্নতর যাপন, লোকাচারের স্মৃতি, জলীয়তা আর বাতাসের শুশ্রূষা। তেমনই তাঁর প্রকাশের ভাষা আর যাপনগত পৃথকতা। যেমন 'মাছ' গল্পের গোড়াতেই বর্ণনা হল :

> পদ্ধতিগত আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সে দেড়ফুটের মতন বাঁশের খণ্ডটি ছুঁড়ে দেয়, তারপর তারই উপর জাল ফেলে। এই পদ্ধতির প্রথাগত নাম 'বাজফেলা'। কার্যত বাঁশের খণ্ডটি টোপ হিসেবেই শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারা-জল ও বাঁশের খণ্ডটির সংঘর্ষে উৎপন্ন শব্দ, শব্দে মাছ আসে, বিশেষ করে রাই মাছ।

একেবারে আঞ্চলিক একটা মাছ শিকারের পদ্ধতি, রাই মাছটি উত্তরবঙ্গের, ধরছে যে জেলে তার কোনও নাম প্রথমে নেই, আছে 'সে'-র উল্লেখ। নাম বিশেষের বদলে সর্বনাম। গল্পের তৃতীয় স্তবকে এসে জানা যাবে তার নাম শচী—জানা যাবে 'মাছ, মাছ ছাড়া সর্বস্ব গল্পহীন শরীর কাছে। যে কোনো কথার ভূমিকা অচিরে ফ্যাকাশে হয়ে মাছের কথায় চলে আসে সে।'

এর পরে আছে একটা মোচড়। শচীর মাছ ধরার স্যাঙাৎ নিত্য তাকে বলে—'সম্বন্ধি, তুই নিশ্চয়ই কাল শান্তির সাথে শুয়েছিলি। শান্তির সেন্টের গন্ধে তোর মাথা বিগড়ে গেছে।' এ বারে লেখক সাঁটে জানান : 'শান্তিই একমাত্র ওষুধ যা শচীকে থামাতে পারে। শান্তি শচীর বউ। তখন লাইনের।'

বাড়ির বউ সস্তার সেন্ট মেখে কেন লাইনে নাম লেখাল, আবার শচীই বা কেন তার কাছে যায়, তার সারা গায়ের মেছো গন্ধে বাসি সেন্টের গন্ধ লেখকের জাত বুঝিয়ে দেয়। তবে তাঁর সংযমও চোখে পড়ে। গল্পকে শচী-শান্তির দাম্পত্যকলহ আখ্যানে বা প্রেম ও প্রেমহীনতায় না টেনে নদীর স্রোতের টানে নৌকো ভাসানের সঙ্গে মাছের দিকেই চলে যান, চলে আসেন নিত্য জেলের দর্শনে। যে কেবল প্রত্যাশার চোখে চায় নদীর দিকে—মাছের প্রত্যাশায়। 'সে ভাবে, কেবলমাত্র জীবন ধারণের জন্য সে জেলে নয়। মাছেদের প্রতি তার গভীর গভীর ভালোবাসা এমনকী তাদের মারবার পরেও সে তাদের প্রতি মমত্ব বোধ করে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই এদের মারতে হয়। এই নিয়ম, নিয়ম পালনই জীবিকা। কেউ না কেউ, কাউকে না কাউকে, কোনো না কোনভাবে হত্যা করে চলেছে।'

এই শেষ বাক্যটিই প্রায় রঘুপতি উচ্চারণ করেছিলেন 'বিসর্জন' নাটকে। তবে পীযূষ তার দ্বারা গ্রস্ত হয়েছেন বলে মনে হয় না। তাঁর গল্পে হত্যা বা খুন আছে, আত্মহনন ও আত্মপীড়ন আছে কিন্তু মর্বিডিটি নেই—কারণ তিনি নির্মম দ্রষ্টা।

তাই নির্বিকার দ্রষ্টার মতো লেখক বর্ণনা করেন : 'কী একটা কাজে এসে গায়ত্রী দেখে নখের আঁচড়ে রীতার সমস্ত মুখ রক্তাক্ত। সে তার নিজের স্তন নিজেই আঁকড়ে বসে আছে, তাতে প্রতিটি নখের কেন্দ্রবিন্দু থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে।' এ হল একটি গল্পের শেষ অংশ, গল্পের নাম 'ক্ষরণ'। পাঠক এই আত্মপীড়নের কাহিনি বুঝতে পারবেন অনেক পরে। অথচ গল্পের সূচনাতেই রয়েছে শকুনের বৃত্তান্ত। পাড়ার কেউ টের পায়নি, কিন্তু একটি তালাবন্ধ ঘরে গলাপচা মৃতদেহের সন্ধানে নেমে এসেছে মৃত্যুদোসর শকুনের পালের আছড়ানো—সাটু খুন হয়ে পড়ে আছে। এই সাটুই রীতাকে ধর্ষণ করেছে একদিন। সাটুর হত্যাকারীর পরিচয় পাওয়া যাবে না কিন্তু—

> রীতার কাছে তার বেঁচে থাকাটাই নিরর্থক হয়ে যায়। সে যেন সাটুকে খুন করবার জন্য বেঁচে ছিল এতদিন।
>
> 'যাঃ আমার যৌবন নিন্দার, আমার যৌবন লজ্জার'
>
> রীতা একথা ভাবতে ভাবতেই আত্মপীড়ন করে স্বহস্তে, রক্তাক্ত করে স্তন।

তাই বলে ভাবার কারণ নেই যে, এ ধরনের গল্প লেখায় পীযূষ ভট্টাচার্য স্বচ্ছন্দ। তাঁর হাতে লোকাচার বা গ্রামিক দেশাচারের উদ্‌ভাস বরং অনেক সাবলীল লাগবে পাঠকের। 'গারসি সংক্রান্তির কাক' বা 'দণ্ডকলসের ফুল' জাতীয় গল্প-নাম একটা আবেশ তৈরি করে—ধরতে চায় এক অজানা লোকজীবন, অন্তত আমাদের গড় পড়তা পাঠঅভিজ্ঞতায়। পল্লীর আয়ুর্বেদিক জগৎ তার ভেষজ বিচিত্রা নিয়ে এমনভাবে তাঁর গল্পে আবহ তৈরি করে যা লেখকের বহুদর্শিতার পরিচয়বাহী। স্বর্গে আর মর্ত্যে দুটি পা রেখে গারসির কাকের অবতরণ

দিয়ে যে গহন উদ্ভিদের গন্ধ আখ্যানে মেশে তাতে যোগ হয় ক্রমে ক্রমে কত না অজানা শব্দ আর অনুষঙ্গ। গল্পের বাগানে :

> পাঁচিলের ও পারে একপাশ ঘেঁষে অর্জুন কালমেঘ বামুনহাটি হাড়জোড়া ক্ষেত পাপড়ার বাগান।...রুদ্রজটার গৃহস্থ নাম ঈশের মূল। সাপখোপ নাকি আসে না এতে। ...যাহা চিচিঙ্গে তারই বন্য ভ্যারাইটির আয়ুর্বেদীয় নাম দুধিপুষ্প, স্মৃতিবর্ধক।

গৃহস্থের ব্রতপালন আর ব্রতভঙ্গ নিয়ে জমাট এক শরীরে স্বপ্ন আর স্বপ্নময় জড়িমা এক বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

এর চেয়ে নিবিড় লোকায়তের টান ভরা আছে 'ভাসান' গল্পে, যাতে পূজার চেয়ে ভাসান নিয়ে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা টানটান হয়ে থাকে। পুজো উপলক্ষে জনসমাগম, মেলা, শাঁখা পরা—সেই শাঁখা পরা নিয়ে জড়ানো মিথ বেশ অনায়াসে এসে যায় লেখকের কলমে। মনে হয় যেন কথক নন, পীযূষ, যেন মেলারই উদ্বেলিত অংশভাগ। এবং নিখুঁত তাঁর পরিপার্শ্ব জ্ঞান, তাই বলতে ভুল হয় না যে,

> মূর্তির মাথায় আটচালার পাশেই বট-পাকুড়ের যুগল অস্তিত্ব। যা অন্য সময়ে ঘন অন্ধকার সৃষ্টিতে সাহায্য করে। বট-পাকুড়ের আশেপাশে কোমরডোবা জঙ্গলে জোনাকি নেই, ঝিঁ ঝিঁ ধ্বনি নেই। এতো হৈ হট্টগোলের মধ্যে পাতা থেকে ঝরা শিশিরের ফোঁটার টপ্ টপ্ আওয়াজ যেন শুনতে পেল বিভাস। সে চকিতে মূর্তি দেখে।

আমরাও দেখি এক অলৌকিকতাময় গল্পের মগ্নচারী পট।

এর পিঠোপিঠি আসবে যুগে যুগে প্রচলিত দেবীর শাঁখা পরার লৌকিক উপাখ্যান, যাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখাটাই স্থানীয় নারীকূলের বহুকালের অভ্যাস এবং তারই জাদুটানে গল্পের নায়িকা নিঃসন্তান বিনি বহরমপুরের হাতির দাঁতের শাঁখা পরে। তারপরে চলে বলির পরে বলি। একশো ত্রিশজন মানুষ, একশ ত্রিশটা পাঁঠা। তাদের তীব্র অন্তিম চিৎকার আর ভক্তদের উল্লাস। পুজোর উপকরণ হল কারণবারি, গাঁজা, বোয়াল মাছ, শাঁখা। সব দিকে লেখকের চোখ।

প্রশ্ন হল এখানে বিনি আর বিভাস কেন? অবশ্যই মেলা দেখতে নয়—এ তাদের পুত্রেষ্টি প্রয়াস, তাদের সন্তানহীন যৌবনে। মানতের মাদুলি আর লোকবিশ্বাস তাদের ভরসা। যেন প্রত্যাদেশের মতো শোনা যায়,

> সব মানুষেই বোঝে, কোনো কিছুকে তাকে ভালো-বাসতে হবে। ভালোবাসতে এবং ভালোবাসা পেতে, নিজের সুখ নিজেই দেখতে চায়। ভাসানের পর তোকে ও বিনিকে ভেজা কাপড়ে উঠে এসেই ভালোবাসতে হবে। এই নিয়ম, এই প্রাচীন রীতি, কিংবদন্তী, কেউ নাকি বিমুখ হয়নি।

শরীরী সঙ্গম না বলে এই যে ভালবাসা বলা তা ভারি মধুর ও মায়াবী।

পরাবাস্তবের আভাসে বোনা গল্প রচনাতেই পীযূষের কৃতিত্ব সবচেয়ে মৌলিক তাতে সন্দেহ নেই। ভুল বললাম, গল্প রচনা নয়, না-গল্প রচনায়। 'জ্যোৎস্নালোকে হুইলচেয়ার' এমনই এক রচনা যার ব্যাপ্তি মাত্রই দেড় পৃষ্ঠা। হুইলচেয়ারে বসা একজন পুরুষ, দোলন নামক এক নারীকে ধর্ষকের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে যার এই স্থবিরতা—তার বসে থাকা জ্যোৎস্নার শ্রাবণে প্লাবনে, আর ভাবা, এই নিয়ে শীর্ণ এক আখ্যান কিন্তু তীব্র সংবেদী। আত্মকথনে তার বিবৃতি :

> হুইলচেয়ারে বসিয়ে যেখানে বসিয়ে রাখা হয় আমাকে সে ভাবেই থাকতে হয়। বাড়ির বাঁধা কাজের লোকটিই নিয়ে আসে এখানে। এর জন্য সে বোধহয় বাড়তি পারিশ্রমিক পায় চুক্তি অনুযায়ী। কে দেয় কত দেয় তা জানি না এবং কে নিয়ে আসছে প্রতিদিন তার নাম পর্যন্ত জানি না। জেনে কী হবে? মৃত্যু-র অশরীরের গল্পের ভিতর দিন বেশ কেটে যাচ্ছে। ...উঠে দাঁড়াবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে হুইলচেয়ারে ওভাবে বসে থাকতে থাকতে মনে হয় সকলেই আততায়ী।

মৃত্যুর অশরীরের গন্ধ আমাদের স্পৃষ্ট করে। এখানে আমাদের মানে সকলের নয়, আমরা সেই বিরল পাঠক, যারা পীযূষ ভট্টাচার্যের লিখন ও লেখকতাকে সম্মান করি। বুঝি যে কাকে বলে খাঁটি অস্তিত্ববাদী রচনাশৈলী। গল্পের শেষ পংক্তি খুব দ্যোতনাময়। আত্মপক্ষে কথক-লেখক ভাবছেন :

> একসময় পৃথিবী আবার আমাকে অধিকার করে নিলে দেখি, কেউ কোথাও নেই—দিগন্ত শূন্যে চাঁদের ছায়া মায়ার বিস্তারে রত সাপের খোলসটির উপর।

এ ধরনের গল্পের পাশে 'বোধন পর্ব' গল্পটি অনেক সমাজবাদী এবং বঙ্গের উত্তর প্রান্তের ক্ষুব্ধ মানসের প্রতিফলক। গল্পটির সম্পদ হল উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপভাষণ ও বিভাষণ। 'ফটক তো খিচ্‌লেন্, মোক একটা দিবার নাগবে'—এই হল ভূমিজ ভাষা। জলের জন্য তৃষিত ভূমির কান্না এ গল্পে, সেইসঙ্গে নারীদের গোপন সংস্কৃতি। 'ফল ফাকর না থাকলি কি মেয়েমানুষকে মানায়?' নারী জমি কর্ষণ সব মিলিয়ে চমৎকার এক বর্ণালী।

এতক্ষণকার আলোচনায় পাঠক নিশ্চয়ই বুঝেছেন পীযূষ ভট্টাচার্য পশ্চিম বাংলার উত্তর খণ্ডে বসবাস করে দায়বদ্ধ সারস্বত কর্মের একজন লক্ষ্যস্থির পদাতিক। তাই তথাকথিত মধ্যবিত্তের প্রেম প্রেম খেলা, নৈতিক অসততা, ভোগবাদী ইতরপনা থেকে তিনি বহু দূরের চেতনাসম্পন্ন প্রগতিপন্থী মানুষ। তাঁর লেখায় যৌনতা বা নারী শরীরের পেশাদারি বর্ণনা নেই। এমনকী সব চরিত্রকে সুঠাম বৃত্তাকার পরিণতি দানেও তাঁর অনাগ্রহ। পড়তে পড়তে চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক কিংবা আত্মীয়তার সূত্র বুঝে নিতে সময় লাগে। তিনি ন্যারেটার নন, দ্রষ্টা বা কথক এক গভীর অর্থে। সেই জন্যে গড়পড়তা বর্ণনা বা নিসর্গের স্বাভাবিক পরিবহ তাঁর গল্পে ভাবনা স্বাতন্ত্র্যে অন্য চেহারা নেয়।

সৌজন্য- গল্পবিশ্ব

'নির্বাচিত গল্প' সংকলনের ১২০ পৃষ্ঠায় তাঁর ২০টি গল্প এঁটে গেছে—এর থেকে বোঝা যাচ্ছে তাঁর গল্পের অবয়ব সংক্ষিপ্ত এবং তাতে ঘটনার ঘটনঘটা বা উদ্বেলিত নাট্য নেই। তিনি যেন অলস শিমূলতুলোর মতো গল্পগুলোকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। ফলে পাঠের পরও যেন মনে হয় গল্প শেষ হয়নি। আমি তাঁর তিনটি গল্পের শেষ পংক্তি ক'টি আহরণ করে দেখাচ্ছি।

১। তবে কী মানুষ পৌঁছে যায় এক একসময় এই অনুভূতিতে তখন অপরের সঙ্গে ভেদাভেদ থাকে না, অভিন্ন, জীবনের এপিঠ-ওপিঠ।

২। আকাশ তো চিরকালই শূন্য। তার নিজস্ব নিশানার হদিশ বা কী, তবুও যেন প্রবল বৃষ্টির ইঙ্গিত নিয়ে এদের মাথার উপর ঝুলে আছে। সবক'টি মানুষই যেন প্রবল বৃষ্টিতে মাটির মতন তালগোল পাকিয়ে যাবে, এই আশঙ্কায় এক সময় পৃথক হয়ে যায়।

৩। কারো কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না, শুধু পাওয়া যাবে নিজস্ব রক্তপানে একটি সভ্যতার ইতিহাস। এত সকালে হাওয়া চাবকে ধরে ঘোরাচ্ছে মাটিকে, বোঝা যাচ্ছে শুরু হতে চলেছে আরও একটা রুক্ষ দিনের।

পীযূষ ভট্টাচার্য অস্তিবাদী লেখক, তাই ঠারেঠোরে তাঁর সব কথা বলা এবং অনেকটাই না বলা। তবে তাঁর পরিণামী আশাবাদ অস্তিত্ববাদীদের মতো যন্ত্রণাজর্জর অজ্ঞেয়তাধর্মী নয়। তাই তিনি লিখতে চান :

> আত্রাইয়ের নাব্যতা ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায় আছি। ময়ূরপঙ্ক্ষী নৌকা ভেসে যাবে। নদীর প্রতিটি বাঁকের ঘূর্ণির প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্য মাঝিরা মশান কালী বা সত্যপিরের গান গেয়ে উঠবে। নদীপথের পাশে থাকুক না আধুনিক রাস্তা। ছুটে যাক সভ্যতার দ্রুততম যান। অসম্ভব এক মেলবন্ধনের কথা ভাবি সব সময়।

প্রতীচ্যের একজন মনস্বী লেখক বলেছিলেন "What is essential is invisible to the eye", পীযূষ দেখালেন এর উল্টো পিঠ, অর্থাৎ, দৃশ্যমানতার মধ্যেকার সারাৎসারটুকু।

'নিরক্ষ রেখার বাইরে' বৃত্তের বাইরে নয়

রমাপ্রসাদ নাগ

পীযূষ ভট্টাচার্য এখন পর্যন্ত বহুল প্রচারিত নন। পাশাপাশি একথা অবশ্যই বলার থাকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা নির্মাতার প্রতিভার সহার্থক সর্বদা হয়ে ওঠে না। মনস্ক পাঠক পীযূষ ভট্টাচার্য-র লেখা পড়েন, শব্দ ও নৈঃশব্দের দ্বিবাচনিকতায় জগৎ ও জীবনের ক্রমউন্মোচনের উদ্ভাসনে আপ্লুত হন। ভাবনার স্রোতে জায়মান থাকে প্রবহমান ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার অনির্দেশ্যতা। সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে থেকেও লেখক নতুন চেতনায় সমগ্রতাসন্ধানী। তিনি ভৌগোলিক—ঐতিহাসিক শোষণ — সংদমনের ছবিগুলোকে সার্থকভাবে তুলে ধরতে পারেন। ডিসেকোর্সে চলে আসে যুগ চৈতন্য। হানস-গেয়র্গ গাদামারের ভাষ্য অনুসারে বলতে পারি লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির অভিজ্ঞান গল্পের ভেতরে এক সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে ভিন্নতর সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে চলে যেতে পারে। গল্পে তৈরি হয় এক নবতর অর্থ। অনন্য ভাষাবিদ্যা হয়ে যায় একক ও স্বয়ম্ভু।

পীযূষ ভট্টাটার্য

নিরক্ষরেখার বাইরে

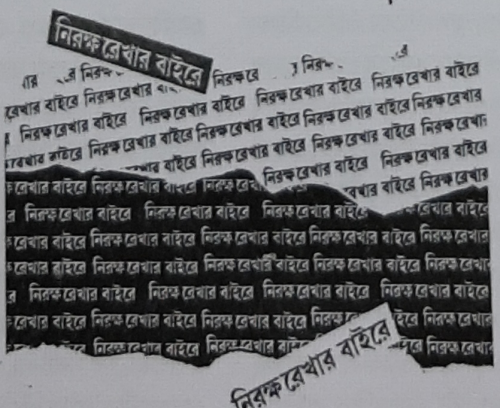

'নিরক্ষরেখার বাইরে' নভেলটি সময়ের সার্থক প্রতিবিম্ব। ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষার সাথে হৃদয়াবেগ মিশে গিয়ে তৈরি হয়েছে যাদু পরিবেশ। প্রতীকের মাধ্যমে কথাকার পরিবেশ ও পরিস্থিতির গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। ভয়ার্ত সময়ের অন্ধকার ঘেরা রাত ধীর অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে ফুটে ওঠে। লেখকের অভিজ্ঞতা, জীবনবোধ, অন্তর্দৃষ্টি এবং শিল্পিত চেতনার ওপর রচনার সফলতা নির্ভর করে। 'নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী, আর পৃথিবীর পরে ওই নীল আকাশে', নীল আবরণের মাঝে শুয়ে থাকে কেশবতী কন্যা আর খুঁজে পাওয়া এক দণ্ডিচিহ্ন জীবন। বীরসা মুণ্ডা উলগুলানের ডাক দিয়েছিলেন এই জীবনকে ভালোবেসেই। রোরুদ্যমান ইতি-র পরে পুণরায় শুরু হওয়া এক আরব্য উপন্যাস। অলীক বিস্ময়। নিয়ন্ত্রণরেখার গণ্ডির বাইরে সবকিছু। বন্ধ্যা নারীর এলোচুল। বাবু মিঞা হানিফের দেওয়া ইরানি চশমা, আকাশের অলৌকিক মেঘ, মানুষের গলিত দেহের বিমর্ষ গন্ধ, উর্ধ্বমুখ উটের প্রাচীনতার সঙ্গে একাকার হয়ে ডেকে ওঠা, সমস্ত কিছু। অতীত থেকে আরো বেশি অতীত কিসের প্রতীক্ষায় থাকে? জীবন ও কল্পনার অথই ছায়ার দিকে হেঁটে যাওয়া নভেলেট 'নিরক্ষরেখার বাইরে'।

নির্মাণ প্রক্রিয়ায় নিমগ্ন লেখক অনুভব করেছেন 'অপর এক জালে

আবদ্ধ মানুষকে জানার অদম্য ইচ্ছাই' তাঁকে সৃষ্টিকর্মে প্রয়াসী রেখেছে। এই প্রক্রিয়ায় কখনই তিনি লেখকের নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ থেকে বিচ্যুত হননি। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনা, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, 'নীল অস্বচ্ছ আলোর ভিতর বসে বলে যাওয়া' কথকের কথকতায় মেলে ধরেছেন পাঠক দৃষ্টিগোচরে। সচকিত ঘোষণা রেখেছেন 'মৃত্যুর মুহূর্তে' পৌঁছে যেন জীবন জীবন হয়ে উঠছে। মৃত্যুকে তো বোঝা যায় না। মেনে নিতে হয়।' ভূগোলের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্য এক ভূগোলে যাবার কথাও। কুলসুম, কামাল, সদানন্দ, হাজীসাহেব, মঙ্গল হাঁসদা, সুনন্দা, বাচ্চু মিঞার কথা এসে যায়। আকছা বা দেবকোটের প্রকৃতি, মানুষজন, সংস্কৃতি, লোকাচার, এসব চরিত্রের রাজনৈতিক বোধ ও চেতনা এবং ঘটনার অভিঘাতে তাদের প্রতিক্রিয়া বিশ্বস্তভাবে উঠে এসেছে উপন্যাসিকায়। ব্যবহৃত হয়েছে লোকসংস্কৃতি চেতনা ও এক অলৌকিক বর্ণমালা। আপাত বিচ্ছিন্ন মনে হলেও উভয়ে পরস্পর অন্বিত।

বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ থেকে শুরু হয়েছে 'জীবন-মৃত্যুর প্রবল দ্বন্দ্বের ভাবনাজগৎ'। বিপন্ন বিস্ময়ে প্রোথিত এক ভয়ানক শূন্যতা। বয়ে যায় সমস্ত ব্যাপন জুড়ে জীবনের স্থায়ী ছাপ কিংবা জীবনের ওপর মৃত্যুর সুতীব্র অভিক্ষেপ। তাপ ও দাহে আস্পৃষ্ট জীবন থেকে সরে যাওয়া অসম্ভব ঠিক সেরকম মৃত্যুর কাছ থেকে বাণবিদ্ধ প্রস্থান ছাড়া অন্যকিছু সম্ভব নয় — 'গর্ভ উৎপন্ন হয় মৃত্যুর ক্ষণকে নির্দিষ্ট করতে'। বদ্ধতা এক ভয়ানক অভিমাপের জগৎ তৈরি করে। চরাচরব্যাপী আলোর মাঝে যে আশ্চর্য অভয় থাকে তা অধরাই থেকে যায়। তাই আখ্যানে মিঞাসাহেব যাযাবরী হয়ে যান। চেনা পৃথিবীর মাঝে অচেনাকে জানতে নতুন উদ্যমে শুরু হয় যাত্রা। হানিফের নেতৃত্বে আকাশের রাতজাগা নক্ষত্রকে চিহ্নিত করে হাজী সাহেবের মেজবিবি-কে সাথে করে অগ্নিপরীক্ষায় যাত্রা করেছিল বাচ্চু মিঞা। সে জানত আক্রান্ত ও আক্রমণকারী নিয়ে সভ্যতার ইতিহাস। সে শোনে শঙ্খের সামুদ্রিক পবিত্র আহ্বান গর্ভাধারণের আকাঙ্ক্ষায় থাকে। পাঠকের মনে হয় এ ভূখণ্ডের মানচিত্রে কল্পিত রেখা — নিরক্ষরেখা, তার বাইরে আমরা সকলে।

আসলে এখানে সক্রিয়, লেখকের বীক্ষা — উপন্যাসিকায় যে আদিবাসী জীবনের উৎখাত হয়ে যাবার আখ্যান তিনি বলেন তারা ১৯৩২-এর আকছা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে খাজনা বন্ধ করে পুলিশের বন্দুকের সামনে 'হুল' ঘোষণা করে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই বিদ্রোহ আখ্যানে আবার এল মঙ্গল হাঁসদার ছবিতে। তার মনের ভেতরে নিজস্ব হাহাকার করা অন্ধকার রয়ে যায়। ফুলমনিকে ধর্ষণ করে দুজন বিধর্মী যুবক ভগ্ন কেল্লার প্রাচীন গন্ধের মধ্যে ফেলে গেলে আবার উঠে আসে সেই হাহাকার। নিঃস্ব জাতির এক দিশাহীন অস্তিত্ব। দীর্ণতার অস্তিত্ব। মুখ গুঁজে বসে থাকে মঙ্গল হাঁসদা। জীবনের সামুদ্রিক ঝড় এসে নিষ্ঠুর দস্যুর মত নিয়ে গেছে সব। উদ্বাস্তু, স্বভূমিচ্যুত এক জীবন। ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইতিহাসের এই উত্তরাধিকারকে লেখক নিয়ে গেছেন কল্পনার সংযোগভূমিতে। অতীতের ভূমিতে পাঠক লক্ষ্য করেন বর্তমান সময়কে। কোরবানির জন্য আনা উট মরুভূমির বালিতে একমাত্র স্বচ্ছন্দ হয়। জন্মভূমি থেকে সরে আসার অর্থ রাজকীয় মর্যাদা থেকে ছিটকে করুণার মধ্যে বাঁচা। তেমন এক শূন্যতার মধ্যে থেকে যায় মূল উৎখাত জীবন। উটের মত স্থির হয়ে থাকে মঙ্গল হাঁসদা। আশা রাখে শেষ হবে না কিছুই, নতুন নতুন সীমারেখায় অঙ্কিত হবে ভৌগোলিক কোন রেখা—নিরক্ষরেখা। সময়ের আবরণ পুড়ে তৈরি হবে পূর্ণতার পিপাসা। বাস্তবের এই অনুসন্ধানটিকে অনুভব না করলে পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

শিল্পের ক্ষেত্রে 'ফেনোমেনাল রিগ্রেশন' বলে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। শিল্পীর চোখেদেখা বাস্তবের চাইতে শিল্পের বাস্তব আলাদা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় বাস্তববাদের সংকীর্ণতা অতিক্রম করে বাস্তবোত্তরে পৌঁছুতে পারলে শিল্প হয়ে উঠবে মহৎ। সেখানে বহুস্তরের অভিজ্ঞতা ও মাত্রা একে অন্যের সাথে জড়িয়ে থাকবে। রাজনীতি ও ধর্মের বৃত্তে আবদ্ধ মানবিকতার সংকট আলোচ্য আখ্যানকর্মের মূল বিষয়বস্তু। লেখক যে ভাবে জীবনকে দেখেছেন তার সাথে প্রাচীনতার গন্ধ এবং অন্যান্য উপাখ্যান মিশিয়ে কাব্যময় কল্পনায় সৃষ্টি করেছেন এক গভীর মানবিক টান। চর্যাপদ, রামচরিত, কোরান শরিফ থেকে শুরু করে কৃষক বিদ্রোহ এবং আধুনিক জীবনাচরণের মাঝে কাহিনিতে এক আশ্চর্য দ্রুতগতির সংশ্লেষ। হাজিসাহেব প্রায় বিবেকের ভূমিকা পালন করেন। গুনাহের বিচার প্রার্থনায় সর্বশক্তিমানের কাছে ভীষণ মনস্তাপে তিনি নতজানু হয়ে থাকেন। আরো একবার চেষ্টা করে দেখতে তিনি আবার কেবালামুখী। মেজবিবিকে তালাক না দিয়ে পতিত রেখে দেবার গুনাহ্ তাকে অস্থির করে দিয়েছিল। কুটুম্বপক্ষী উড়ে গেলে কুলসুমের শূন্য নীড় হাওয়ায় ওড়ে। শূন্যতা ঝুলে থাকে। প্রশ্নের অনিবার্যতায় উঠে আসে নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন যন্ত্রণাবিদ্ধ নায়কের আত্মউপলব্ধি। বেদনার অনুভূতি। হয়ত কিছুই নয় তবু শূন্য থেকেও যাত্রা শুরু করা যায়।

প্রাত্যহিক জীবনের অনুপুঙ্খে মিশে থাকে নারীর বৈষম্য ও বঞ্চনার ইতিকথা। নারীও স্বাধীন, সে তার স্বাধীন ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা ও দৃঢ়তা রাখে। ভাস্বর হয় স্বাধিকার অর্জনের ইঙ্গিত। জীবনের এক বিশেষ মোড়ে দাঁড়িয়ে সমগ্র বেঁচে থাকার প্রক্রিয়াটিকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে পুরুষ নির্ভরতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয়। কুলসুম নিজের নির্ভার শরীর অসীম শূন্যে ওড়াবার জন্য, ফেরেস্তার ডানা পাবার আকাঙ্ক্ষায় নিজেকে দুলাভাই-এর বন্ধুর কাছে উড়িয়ে দিয়েছিল। অথচ কামালের মৃত্যুর পর তার ভেতরে সুপ্ত ঘোড়াকে আড়াই পাক দিয়ে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মজনু শাহ যেন আর্তনাদ করে ওঠেন। 'দ্রুত সঞ্চারমান প্রচুর বারিবর্ষী মেঘ' হয়ে স্থানীয় এম.এল.এ সুনন্দা অঞ্জনের কাছে নগ্ন মমতা বিস্তার করে দিয়েছিল তার শরীর জুড়ে। নদীর লোহিত্যের মত এও তো এক ধরনের প্রতিবাদ। প্রতিবাদী সাঁওতাল তরুণদের উদ্দেশ্যে তার অমোঘ নারীবাদী উচ্চারণ '... ... তোকেও জনম নিবার সময় একজন মেয়ে মানষ্যি লাগছিলরে— আমার মতন মাইয়া মানষ্যি'। সমস্ত উপন্যাসিকায় এটি সবচাইতে অমোঘ প্রশ্ন। নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখতে দেখতে ভিন্নতর এক বাস্তবে চলে যায়। কিম্বা কুলসুমের শরীর ঘনসবুজের গুরুগম্ভীর রঙ নিয়ে ঝাঁকড়া মাথাওয়ালা বৃক্ষ হয়ে যায়। ভাই-এর অপরাধে স্বামীর কাছে চিরকাল পতিত থেকে যেতে বাধ্য হয়েছিল যে মেজবিবি তাকেও বখতিয়ারের সমাধির ধ্বংসস্তূপের ভেতর উঠে এসে মিশে যেতে হয় কোরবানীর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে এক অলৌকিক যাত্রায়— 'সামনে এক স্বচ্ছ জলের নদী, খেয়াঘাট, সমস্ত নারীরা সন্তানবতী'। সুনন্দার মা দণ্ডি কেটে কেটে এগিয়ে গিয়েছিলেন, সুনন্দার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পথ জুড়ে দণ্ডিচিহ্ন খুঁজে ফেরে। এই ফিরে দেখা একান্তভাবেই নারীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। অলৌকিকতা মিশে আখ্যানের নারী চরিত্রগুলি তাদের কালিক

স্থিতি নিয়ে রূপকথাধর্মিতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

যে কোন সাহিত্যকর্মের অর্থ অনন্তকালের জন্য স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। লেখকের মানসবস্তুর সঙ্গে তার লিখিত সাহিত্য কর্মের ভিন্নতর ব্যাখ্যা সমূহের অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। লেখক অর্থ সংযুক্ত করে দিলে পাঠক তাতে নব নব তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পারেন। তবুও একটি ডিসকোর্সকে যখন আলোচনায় গ্রহণ করা হবে তখন আমাদের অবশ্য কর্তব্য হল 'টে'টের অন্তর্গত বর্গকে পুনর্গঠন করা'। স্থান, কাল, পাত্র, ইতিহাস, বোধ, চেতনা, রচনারীতি বিশ্লেষণ করলে শিলের অনুসন্ধিৎসা বিমোচিত হতে পারে। বাঙ্ময় হতে পারে ভিন্নতর মাত্রা। মানুষের কীর্তিগাথা প্রতিক্রিয়াহীন হতে পারে না। সবিস্তার টানে আমাদের মনে তার মুহূর্মুহু উপস্থিতি। ক্রিয়াশীল পাঠে পরিস্ফুট হয় দীর্ঘশ্বাসের মত মজনু শাহের অশ্বক্ষুরধ্বনি কিম্বা নবদ্বীপ বিজয়ান্তে দেবকোট গঙ্গারামপুরের রাস্তায় দশহাজার সৈন্যের কুচকাওয়াজ, ত্রিতালে ছোটা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। ইতিহাসের এইসব ছবি যেন 'আর্কিটাইপাল' হয়ে মর্মান্তিক এক লাঞ্ছনার ছবি উপস্থাপিত করে। অন্যান্য দেশের মত প্রাক্‌আর্য বাংলার জনজীবনের 'এপিস্টেমে' অবস্থিত ছিল এক 'সর্বপ্রাণবাদী আদি-অস্ত্রাল কৌম সমাজ'। সেই 'জ্ঞানখণ্ড' প্রতিভাত হয় চর্যাপদে'র দোঁহার ভেতর। লৌকিক সমাজের এপিস্টেমে'র সেই চিন্তন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত। উৎস থেকে বর্তমানে ফিরে আসা যায়। বৃষ্টিতে ভিজে মনে মনে সুনন্দা-র চর্যা স্মরণ, 'ভবনদী গভীর, গম্ভীর বেগে বহিয়া চলে, দুই তীর পলিমাটির কাদায় ভরা'। সম্ভাবনার সঞ্চার প্রত্যাশায় কখনো বা এসে যায় সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, '... ...ছিল নীল লাল পদ্মহসিত বৃহৎ দীঘি পুষ্করিনী, আরও ছিল কনক বা স্পেকে ও কেতক ফুলগাছ'। কিম্বা কানে ভাসে পুঁতির মা-র কণ্ঠের ভাসানের গানের সুর, 'ক্ষণে বৈধ্যব্যি রে গদা, ক্ষণে বৈধ্যব্যি রে'। শূন্যতা জন্ম নিয়ে চলে যায় শূন্য আর এক পৃথিবীর দিকে। আক্রান্ত ও আক্রমণকারীর মাঝখানের শূন্যতাই এখন সংবাদ। সাঁওতালি উপকথার 'ভুরকা—আয়ুপইলিপ' নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। অথবা 'মিনহা খালাক্‌নাকুম...অফিয়া নুয়ীকোদুম' (তোমাকে এই মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এই মাটিতেই তোমাকে লীন হয়ে যেতে হবে) মনে পড়ে বাচ্চু মিঞার। চিন্তনের এই অনুভাবনা সমষ্টি এক বহমানতার দ্যোতক। পরাবাস্তবতার পৌনঃপৌনিকতার জাগরণ ঘটে। স্বদেশের লোকায়ত জীবনের সারাৎসারের সংমিশ্রণে তৈরি হয় একটি অখণ্ড ও অনন্তের দ্যোতনা।

অতীত ও বর্তমানের নিরন্তর সংলাপের ফলে ইতিহাস পুনর্লিখিত হয়। শিল্পের ক্রমিক এবং স্থানিক বিন্যাস এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ঔপন্যাসিক তার আখ্যানে সমান্তরালভাবে হাজির করান এক দিগন্তের ইতিকথা। সে কথার বহুত্ব ও বৈচিত্র্যকে পাঠক নানাভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। ইতিহাসের ব্যাপ্ত ভাঁড়ার থেকে লেখক সযত্নে আহরণ করেছেন এক গভীর প্রসারী রূপপুঞ্জ। মূল্যবোধহীন মানুষ বর্তমানে ক্ষমতাশীর্ষে। ধর্মের অর্থহীনতায় পায়ে পায়ে বেড়ি নিয়ে তার পথচলা। আরোগ্যের জন্য আনা কোরবানীর উট জাতিদাঙ্গায় মৃত হয়ে যায়। অথচ এই উত্তরবঙ্গ একদিন সামাজিক মিলন ক্ষেত্র ছিল। সেদিন আত্রেয়ী পুনর্ভবা টাঙ্গনের জলস্রোত তৈরি করতে পারত এক বেণীর রমণীর অবয়ব। উত্তরবঙ্গের মাটি পাঠককে মনে পড়িয়ে দেবে কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা, পাড়নি আন্দোলনের কথা, তোলাগি আন্দোলনের কথা, তেভাগা-র কথা, সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের কথা। ইতিহাসের এই দর্পিত রূপ বর্তমানে প্রায় বিস্মৃত। ঘনায়মান বর্তমান সংকট দিনের লেখক ইতিহাসের সে সব বৃত্ত তুলে এনেছেন সাবলীল দক্ষতায়। জীবনের নিয়ম মেনে যে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলে তা অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মের ভারে ভারাক্রান্ত রয়ে যায়। সামাজিক সংকটে ধর্মের ভূমিকা অবশ্যই আলোচিত হবার দাবি রাখে। লেখক পীযূষ ভট্টাচার্য মান্যতা দিয়েছেন ধর্মের এই স্তরটিকে। প্রসঙ্গতঃ এসেছে চর্যাপদের কথা। চর্যাপদের তান্ত্রিকতা ধর্মাচরণে স্বীকৃতি জানিয়েছিল নারী ও শূদ্রকে। জীবনের স্থিতিকেও এই অভিমত গ্রাহ্য করে। লৌকিক উৎসব উদ্ভুত তান্ত্রিকতা বাঙালির সংস্কৃতির মর্মমূলে। নারীত্বের চরম অবমাননার দিনে ফুলি'র আত্মঘাতে সুনন্দাকে তাই চর্যাপদের কাছে ফিরে যেতে হয়। আদিবাসী লাঞ্ছনায় বুঝি বা সেই কৌম ধর্মমতই হতে পারে উপযুক্ত আশ্রয়ের আধার। আত্মগোপনের কুহেলিকা অপসৃত হলে অধ্যাত্ম চেতনা দৃঢ়তর হতে পারে। জন্ম জন্মান্তরের পথিক আত্মা দ্বিধা জিজ্ঞাসা অন্তে চলে যেতে পারবে সেই অনন্ততার কাছে যার প্রতীক হয়ে আখ্যানে এসেছে 'করোনেশন ক্রুকস'। ধর্মযাজকের হাতের দণ্ড। ন্যায়ের দণ্ড। ন্যায় দণ্ড। যাত্রার এই ভিন্নতর তরঙ্গ আমরা বহন করে যাই অবিরত। মনের আকাশটা জুড়ে 'অকল্পনীয় রঙের বর্ণচ্ছটা, নীল আকাশ পটে আঁকা শ্রীদানবের পুত্র দনুর রূপ'। নিরক্ষরেখার বাইরে হলেও বৃত্তের বাইরে নয় কোনকিছুই। বৃত্তবন্দী পাঠক বাচ্চু মিঞার সাথে একসাথে গভীরভাবে দৃষ্টি মেলে ধরে থাকেন পথের প্রতি।

পীযূষ ভট্টাচার্যের নির্মাণকর্মে গভীর পর্যবেক্ষণ ও অবগাহনের ভেতর দিয়ে উঠে আসে জীবনবৈচিত্র্য। লোকায়ত বিশ্বাস, লোকাচার, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতে বিশ্বাস অমরত্ব পেয়ে যায়। ব্যক্তি আমি'র মুক্তি চলতেই থাকে। বহুবিধ বোধের উপলব্ধির কথা ব্যক্ত হয় জন্যে কথাসাহিত্যে 'কাহিনিগত ধারাবাহিকতা প্রাধান্য পায়নি, কিন্তু কাহিনির বয়ান জীবনের বাঁকে বাঁকে চূর্ণ হয়ে যে বীক্ষণ তৈরি করে' তার কথা নিরন্তর বলে যায়। বাংলার মানুষের সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক আগ্রহ, ভূমিজ মানুষজনের জীবনবোধের শনাক্তকরণ তাঁর বৈশিষ্ট্য। নিজেকে বিযুক্ত করে বস্তু ও সত্যকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়ার ভেতর অন্বেষণ করে নিজেকেই যেন বারবার নতুন করে চিনে ও খুঁজে নিতে চান নিজের লেখালিখির ভেতরে। এখানেই তাঁর সার্থকতা।

বিনা রক্তপাতে দাঁত তোলা অসম্ভব নয়

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখতে এলেন একটু বেশি বয়সে, যেটা ঠিক বাঙালি লেখকসুলভ নয়। এখন এমন হতেই পারে, যে বা যাঁরা 'লিখে খান না' (পেশাদার লেখক বলতে এঁদেরই বোঝানো হয়, যে জন্য বাণিজ্যিক পটুত্ব ও পেশাদারি দক্ষতা-কে এক পংক্তিতেই বসানো হয়, যেন একই কথা। এরকম আমাদের যে কত এক কথা আছে।) হয়তো বা লেখার কাজটি, তার প্রস্তুতি ইত্যাদির জন্য তাঁদের প্রয়োজন হয় একটু মুক্ত পরিসর, একটুকরো স্বাধীনতা। পীযূষ ভট্টাচার্যের জীবন কিছু মসৃণ নয়, পায়ের তলায় একটু জমি পেতে তাঁকে বিস্তর ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে। সেইটুকু পাওয়ার পর পীযূষ ক্রমাগত সরে আসতে থাকেন লেখার দিকে এবং এখন ষাটোর্ধ্ব মানুষটি সর্বক্ষণের পেশাদার লেখক, লেখার হোলটাইমার।

এই পর্বে রচিত যে বইটি এইমাত্র পড়ে শেষ করলাম এবং বেশ একটা আফিম-আচ্ছন্ন ভাব এল, সেই বইটির পরিচয় মুদ্রক-প্রকাশকের জন্য নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাটিতে এরকম, '*Talpatar Thakuma* A Novel by Pijush Bhattacharjee', এই বর্গীকরণে লেখকের সায় আছে নির্ঘাত। আর তা যদি হয়, তা হলে চারটি উড়ো পাতা দিয়ে আলাদা করা চারটি অংশকে পড়তে হবে একসঙ্গে এবং ক্রম মেনেই। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, পড়তে গিয়ে আমার বরং মনে হয়েছে অংশ চারটি একই সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে লগ্ন এবং বিলগ্ন। পাঠক নিজস্ব মর্জিতেই চারটি শিরোনামার যোগফল 'তালপাতার ঠাকুমা' পড়তে পারেন। ওঠা-পড়ার টানা একটা গল্প, প্রধান ও অপ্রধান সব চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে রচনাটি টেনে লম্বা করতে পারলেই উপন্যাস— এমন মত এখন না-চললেও, এই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত উপন্যাস ভালোই চলে। পীযূষ ভট্টাচার্যের লিখন এমন এক সময়-খেলায় নিমজ্জিত, সেখানে অগ্রপশ্চাতের দ্বন্দ্ব ও সংশয় শুধু নয়, কথকের সর্বত্র উপস্থিতিও রীতিমতো বর্তমান। আর এমনটা হওয়ায় বেঁচে ওঠে মৃত লেখক, কেননা লেখক এখানে সর্বত্র বিরাজমান। যা থেকে এমন অনুমান স্বাভাবিক যে, পীযূষ আসলে লেখালিখির আধুনিকতম অবস্থান-কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চান। বা এসব ব্যাপারে তিনি বিশেষ মাথা ঘামাতেই রাজি নন। এই একটি 'না' যে অন্য কোথাও, মানে বাণিজ্যিক লেখালিখির একটা 'হ্যাঁ' সম্ভব করে তুলছে পীযূষের লেখায়, তা কিন্তু নয়। বা সেখানেও আমরা 'না'-এর পুনরাবৃত্তিই দেখি। তা হলে এই লেখকের বীজমন্ত্র কী? তা কি এই গ্রহেরই অন্য এক প্রবীণ লেখকের মতোই— বেঁচে থাকি শুধু গল্প বলব বলে? যা আমরা পালটে নিয়ে বলতে পারি— বেঁচে আছি শুধু গল্প শুনব বলে।

পীযূষ গল্পের গরুর ওপর বিলক্ষণ আস্থাবান। তিনি এই গরুটিকে বাঘের সঙ্গে এক ঘাটে জল খাওয়াতে চান, চান গল্প-গরু গাছে উঠুক, আকাশে চরে বেড়াক, যা-নয় তাই করুক। এবং এই যে বিচিত্র সব কাণ্ড ঘটবে, তার মধ্যে দু'টি বা তিনটি জিনিস অন্বেষণ একপ্রকার নিষিদ্ধ। যেমন, সামাজিক দায়ের ভেজা কম্বলটি টান মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে, আবার ব্যক্তির রহস্যময় এবং একইসঙ্গে অর্থহীন ব্যাপারে এই লেখকের কৌতূহল প্রায় তলানিতে। তাই বলে কি সময়সঙ্গ ছাড়া যায়, যা উপন্যাস বলে চিহ্নিত পরস্পর সংলগ্ন তিন আখ্যানে আওপিছু হটে প্রায় একটি পটের মতন? যে-পটে নির্বুদ্ধিতা আদিমটানে চিত্রিত, যা একপ্রকার অবদমন, অর্থহীন স্বপ্ন এবং প্রলাপও (প্রকৃতই), সেজন্য শিল্প বা নিমিতি থেকে বেশ দূরেই থাকতে চেয়েছে *তালপাতার ঠাকুমা*।

পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন হয়ে পড়ছে, ভাষা প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা হবে বলে, কেননা, গল্পবাহী এই রচনায় ভাষার ভূমিকা গল্পের স্বার্থে অনেক খাটো করে নিয়েছেন লেখক। ভাষার এখানে একটাই কাজ— গল্প বয়ে নিয়ে চলা, সে বাহনমাত্র। সেজন্য, দীর্ঘ জটিল বাক্য, যতিচিহ্নের অকৃপণ ব্যবহার, অপ্রচলিত বা প্রতিদিনের ভাষাভাণ্ডারে যে-শব্দ স্থান পায়নি, তার দিকে হাত বাড়ানো— এসব কোনওটাই করা হয়নি। দীর্ঘ বাক্য রচনায় দরকার হয়নি নানাবিধ যতিচিহ্নও।

যেহেতু আমি গল্পগুলো বলব না (কিনে পড়ে নিতে হবে), তাই লেখকের রচনার স্বাদ দিতে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হল।

ক

ঠাকুমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল সেই পূর্বপুরুষের বিলাপ একদিন না একদিন শুনতে পাবেন। অনুশোচনার সেই বিলাপ শুনবার জন্যই হাকিমের পেয়াদা চলে যেতেই তিনি সেই পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে লক্ষ করতে শুরু করলেন অন্ধকার সেখানে কতখানি ঘনীভূত হচ্ছে কেননা তার প্রয়োজন এক্ষুনি অন্ধকার চতুর্দিক দুর্ভেদ্য হয়ে উঠুক, তার মধ্যে সে অনায়াসে মিশে গিয়ে সেই জলপথের যাত্রী হয়ে যেতে পারে এমন জলপথের যাত্রীদের মধ্যে অনিবার্যভাবে যা ঘটে থাকে সূর্যাস্তের পর— এক আশ্চর্য নীরবতার মধ্যে নিকটতম দাঁড়ের শব্দ শোনা যায় না। শুধু শোনা যায় দূরের দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণের মধ্যে নৌকার দাঁড়ের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত জলের ঢেউ অস্ফুটে মিলিয়ে যাচ্ছে। তখন তো নীরবতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকার সময়।

খ

— এতদিন তো সব ঠিকঠাক ছিল, হাতির পিছনে, হাতির পিঠে ভোটাররা ছুটে বেড়াচ্ছিল কিন্তু বিরোধীপক্ষ বাঘ মার্কা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ভোটে। ওরা জ্যান্ত হাতিকে মোকাবিলা করবার জন্য জ্যান্ত বাঘ খাঁচায় পুরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ভোট না দিলে বাঘ ছেড়ে দেবে—

গ

চরা তো নয় চোরাবালির ফাঁদ যেন। বজরাটাই সেঁদিয়ে

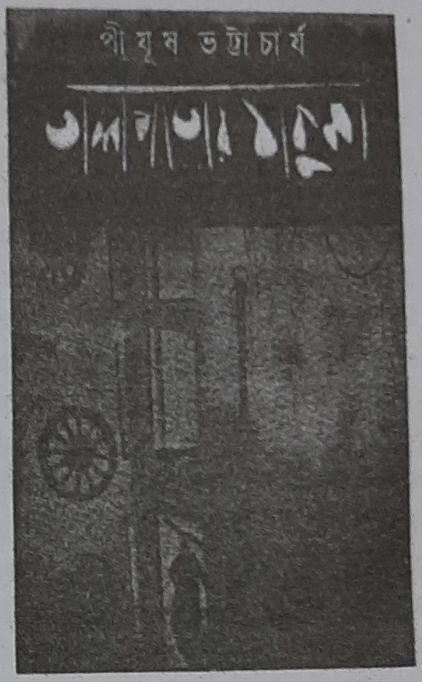

যেতে পারে যখন তখন, এমন আশঙ্কার মধ্যে সে ধলিকে একবার দেখবার আর্জি জানায়।

ঘ

যদি ঠাকুমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করি তখনই প্রথম যে প্রশ্ন অনিবার্যভাবে উঠবে ঘটনা ঘটার সময় কোথায় ছিলাম অথবা ঘটনার এতদিন পর আসাই বা কেন? তখন আর না বলে উপায় থাকবে না উবে যাওয়ার মন্ত্র এবং বেঁচে উঠবার মন্ত্র দুটি ঠাকুমার কাছে থাকলে এখানে আসবার কোনো দরকারই ছিল না। হুজুর মাহাতোর খুনী হিসেবে আমার মাথার দামই ছিল পঞ্চাশ হাজার, জীবিত-মৃত যে কোনো অবস্থার জন্যই ধার্য তা। ঠাকুমা চাইতেন না আলতু-ফালতু লোক এই পঞ্চাশ হাজার হাতিয়ে নিক সরকারের কাছ থেকে। ধরা পড়ার মতন অবস্থাতে আমি যেন অদৃশ্য হতে পারি সেজন্য উবে যাওয়ার মন্ত্রটা আমাকে দিয়েছিল। 'তোকে যদি ধরিয়ে দিতে হয় তা আমিই দেব, টাকা ফিক্সড করে রেখে দেব ব্যাংকে, ফিরে এসে দেখবি টাকা ডবল, যাকে বলে লাখপতি।' তিনি জানতেন ফাঁসিটাসি কিছু হবে না, কাঞ্চন রাজসাক্ষী হলেও হবে না। কেউ বিশ্বাসই করবে না একটা নিরীহ তালপাখা, যার একমাত্র উদ্দেশ্য শান্তির বাতাস বইয়ে দেবার সে যে অস্ত্রে পরিণত হবে কীভাবে? একে যুক্তিগ্রাহ্য করতে হলে তালপাখা হাজির করে প্রমাণ করতে হবে অস্ত্রের সবরকম ক্ষমতা এর মধ্যে আছে।

তালপাতায় ঠাকুমা।। পীযূষ ভট্টাচার্য।। ভাষাবন্ধন প্রকাশনী।। ৭০ টাকা

পীযূষ থেকে পীযূষ পর্যন্ত

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

একটা ছোট এবং প্রান্তিক শহর থেকে গদ্যচর্চা করা। কিন্তু এই শহরে গদ্যের ধ্রুবতারার বাস। তিনি পীযূষ ভট্টাচার্য। তিনি মিথের যাদুকর। তিনি ভিন্নধারার গল্প লেখক। এটা আমাদের গদ্যচর্চার ক্ষেত্রে ভীষণ শুভ ফলদায়ক। আত্রেয়ী নদীর একেবারে তীর ঘেঁষে এই শহরে তার বাস। এখানে নদীও তার বাষ্পীয় আলিঙ্গন জানাতে ভোলে না পীযূষকে।

পীযূষ তো ছিলেনই, আছেনই— এই বালুরঘাটে কিন্তু কি এক ঘূর্ণির মত পাক খেয়ে আমরা ক'জন পরস্পরের খুব কাছে চলে এলাম। ঘূর্ণিটা সৃষ্টিই হয়েছিল পীযূষ থেকে। পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে এ শহরে আমরা অর্থাৎ আমি, সন্দীপন, বরুণ, শুভ্র সেই ঘূর্ণাবর্তে বাঁধা পড়ে গেলাম। অদ্ভুত এক চৌম্বকিয় আবেশ আমাদের বেঁধে ফেলল।

একজন মানুষকে খুব ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি শহরের রাস্তায়, কুয়াশার আস্তরণে, ইলেকট্রিক তারে শক্ খাওয়া মৃত বাঁদুরে কি এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকতে। শুনেছিলাম উনি লেখেন-টেখেন। সব শহরেই এবং কিছু গ্রামে এরকম 'উনি লেখেন-টেখেন'রা থাকেই। তাতে কারও কিছু এসে যায় না। পীযূষ সম্পর্কেও একই দৃষ্টি ছিল স্বীকার করতে অসুবিধা নেই। একদিন তাঁর 'পচন প্রক্রিয়া' গল্পটি কোন ভাবে পড়ে ফেললাম। একেই বলে নিয়তি! আমার মধ্যেও এক জারণ-বিজারণ শুরু হল। নিজের গদ্যচর্চায় লজ্জিত হলাম। উনি এগিয়ে গেছেন কয়েক আলোকবর্ষ আগে। এ শহরে মাছ বাজারে পুরোনো বই বিক্রি হয়। একদিন পনের টাকায় কিনে আনলাম পীযূষ ভট্টাচার্যকে। 'কীর্তিমুখ'। সেখানে আবার পাওয়া গেল 'পচন প্রক্রিয়া'। বহুবার পড়ে চলল পীযূষকে বোঝার চেষ্টা। অবশেষে উনি মৃদু আলোয় ভেসে যাওয়া জাহাজ থেকে একজন যাত্রীর ডাক শুনতে পেলেন। মস্তিষ্কের নিউরোনে ভিনগ্রহীদের মত সংকেত পাঠালেন। সে সংকেত দুর্বোধ্য নয়। তুমুল কড়া নাড়লাম। প্রচণ্ড শব্দ হল। মস্তিষ্কের ঘুমন্ত বাড়িগুলি থেকে কারা যেন জানালা খুলে দিল। সে শব্দ উনি শুনেছিলেন। উনি বুঝলেন—'নদী পুড়ে যাচ্ছে'। আমি ও আমরা বুঝলাম 'সিজলির গ্রানাইট স্তন শালখণ্ডের মতন শরীর মাটিতে আছড়ে পড়ে প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হয়ে' যায় কিভাবে?

পীযূষ ভট্টাচার্য যখন পীযূষদা হলেন তখন সূর্য মেষরাশিতে ছিল কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের সূর্য ঘড়ির মাঝখানের দণ্ডটি হলেন তিনি। কসমিক জগতের থেকে আসা রশ্মি ধারণ করে তিনি ছায়া ফেলেন আর আমি ও আমরা মুহূর্তগুলি ধারণ করি জোনাকি পোকার আলো দেওয়া আর না দেয়ার মাঝে। পীযূষদা এই তো সেদিনও আমাদের চমকে দিলেন 'কাক জংশন' গল্পটি লিখে। একটু ভুল হল, উনি চমকে দেন না, আঘাত করেন সরাসরি। ঘটনার বয়ান না, ঘটনা ঘটবার অভিসন্ধিগুলিকে তিনি বয়ান করেন। তার বয়নশিল্পে যে কোন লেখাই বাবুইয়ের বাসা হয়ে ওঠে একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই শহরের মাটিতে হেঁটেই তিনি অজস্র সম্পদ রচনা করে যাচ্ছেন। পড়লে প্রতি মুহূর্তে আবিষ্কার করার নেশায় পেয়ে বসে। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব—কৃষ্ণবর্ণ বাঁড়ের পীঠে, কুশপুত্তলিকা, জীবিসঞ্চার নিরক্ষরেখার বাইরে, পদযাত্রায় একজন, তালপাতার ঠাকুমা আরও কত গল্পগ্রন্থ যা নিশ্চিতভাবে বাংলা সাহিত্যের আগামী অধ্যায় জুড়ে থাকবে।

এই উত্তরবাংলারই মহান লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়। একজন তিস্তা নদীতে বাংলা সাহিত্যের তরীকে গুণ টেনে নিয়ে গেছেন, আরেকজন রাজনগরে বসে রাজকীয় মেজাজে বাংলা গদ্যকে শাসন করে গেছেন। শ্রী পীযূষ ভট্টাচার্য তাদেরই একজন যিনি নীলফামারি থেকে বকের সাদা ডানার একটি পালক হয়ে আত্রেয়ী ধরে ভাসতে ভাসতে চলে যান পুরাণ প্রদেশে যেখান থেকে মনসা মঙ্গলের মান্দাস যাত্রীদ্বয় উল্টো পথে রওনা দেয় নতুন কাহিনি হয়ে।

পীযূষ ভট্টাচার্যের দেশ সম্পর্কে সতর্কতা

শুভ্রদীপ চৌধুরী

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের ঝাঁ চকচকে ফোরলেন ধরে যাত্রা শুরু করলে স্টপেজের পর স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন এক্সশ্রেণির মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মুখ। দেখবেন এই পথে নেই দরিদ্রসীমার নীচের মানুষ। নেই হেমন্তের পোকার ঝাঁক... নেই তেজ হারানো আকাশের এলোমেলো জলে শুয়ে থাকা...নেই ডগাফাটা চুলের ঘেমো মুখে আছড়ে পড়া,...নেই ঝরে যাওয়া ধান গাছের খড় হয়ে ওঠা...নেই আলোর ঝালর বেশে হামা দেওয়া রোদ...নেই কাঁচা হরিতকির মত চকচকে মুখ কিংবা ধানের পাতানের মত শুকনো শরীরের গলায় সাপের মতো পেঁচানো গামছা।

সেইসব না পাওয়াগুলো সাজিয়ে রেখেছেন, ছড়িয়ে রেখেছেন পীযূষ ভট্টাচার্য তাঁর লেখার প্রান্তরে। যেখানে পৌঁছুতে গেলে ফোরলেন থেকে হাঁটা পথ...আল ধরে এগিয়ে যাওয়া। পায়ের নখে হোমিওপ্যাথির ফোঁটার মত মিশে যাবে শিশির বিন্দু। কলি থেকে ফুল ফুটে ঝরে যাওয়ার দৃশ্য ফুটে উঠবে আত্রেয়ীর বুকে। সামনে এসে নিজের গল্প বলবে মিথ। পাঠক অনুভব করবেন তার ছটফটে অন্ধকে শোনাবার গর্ভযন্ত্রণা।

কখনও বাস্তব চেতনা কখনও প্রতীকায়নের দুনিয়া হয়ে পড়ে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। কারণ ততক্ষণে...হ্যাঁ পাঠক আপনি, হয়ে উঠবেন লেখক পীযূষ ভট্টাচার্যের লেখার ভুবনের বাসিন্দা। যার ভোটার কার্ড, আধার কার্ড নেই আছে ফুরফুরে বাতাস, রোয়াতুলার মত নাচিয়ে চলা রাঙাধুলার গান। আছে পিছলঘাট, আছে হাপুস চোখ।

এবার থেমে থেমে তার পিছু পিছু এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই! ভেবে দেখুন কী করবেন!

লেখক ও পাঠক পীযূষ ভট্টাচার্য

বরুণ তালুকদার

আপনার সবাইকেই যে হজম করতে হবে তার মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি। আপনি মুড়ির মধ্যে চানাচুর হাতড়াতে হাতড়াতে সান্ধ্য সিরিয়ালে শাশুড়ির দজ্জালপনা উপভোগ করবেন আবার পীযূষ ভট্টাচার্য পড়ে বাহ্ বাহ্ করবেন—এ দুটো কাজ একসঙ্গে হতে পারে না। ব্যাপারটা হলো আপনি কোথায় ইনভেস্ট করছেন কতটা করছেন। আমার একজন পরিচিতা একদিন ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, নাঃ আর একটা টিভি কিনতেই হচ্ছে। শাশুড়ির সাথে একসাথে বসে আর সিরিয়াল দেখা যাচ্ছে না। তাহলে ব্যাপারটা হলো গল্পের বিষয়বস্তু পাঠকের বা দর্শকের অন্তর্যামে যখন ঢুকে যাচ্ছে তখন সে আর ইনভেস্টের চিন্তা করছে না। সে ইনভেস্টমেন্ট মানিটারি হতে পারে চিন্তাগত হতে পারে বা সময়গত হতে পারে।

মানুষ তার যাপনকালের মধ্যে সর্বদা মিল খুঁজে বেড়ায়। ফেলে আসা, পারিপার্শ্বিক জীবনরে ছায়াকে সে সামনের দেখতে পেলে পুলকিত হয়। পর্দায় বা কাগজে। আমার জীবনটা এমন হতে পারত বা ভাগ্যিস এমন হয়নি এই টানাপোড়েন নিয়েই পাঠকের অস্তিত্বের লড়াই। সে পাঠক যত উঁচু দরের হোন না কেন। এখন এই অস্তিত্বের বৃত্তটি কি হবে সে পাঠক থেকে পাঠকের তার ব্যাসার্ধ পাল্টে যায়। কেন্দ্র যদিও একই থাকে। পীযূষ যে বৃত্তটাতে পাঠককে এন্টারটেইন করান তার বৃত্তটা একটি জীবনকাল দিয়ে ধরা যায় না। জীবজগতের সামগ্রিক জীবন বৃত্তান্ত বলা যেতে পারে। আমরা ডাইনিং টেবিলে বসে খাই। আমার ছেলে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে বসে কোনোদিন খায়নি। আমার সারা বাড়িতে হয়তো একটাও পিঁড়ি নেই। কিন্তু আমার বাবা শেষ জীবনেও মেঝেতে আসন পেতে হলেও বসে ভাত খেতেন। তারপর মারা গেলেন। মেঝেতে বসে ভাত খাবার লোক আর থাকল না। বাবা ছিলেন পিঁড়ির ধরতাই। পাথরের মেঝেতে পিঁড়ি পিছল তাই সেটা বাতিলযোগ্য। বাবার অভ্যেস তো নয়। তাই আজও আমার ছেলের মধ্যে পিঁড়ির এপিসোড তো রয়েই গেল। আমার ছেলে ছোটোবেলায় দেখেছে দাদামশাইকে মেঝেতে বসে ভাত খেতে। আর তার কারণ শুনেছে দাদামশায়ের স্ত্রীর কাছে গোপনে আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো করে। যেখানে আমি একটি ভিলেন ক্যারেক্টার। তাই পাঠকের বৃত্তটা বড়ই গোলমেলে। পীযূষদা এই অদৃশ্য বৃত্তটাই ধরে চলেছেন। পিঁড়ি নেই বাড়িতে তাও যেন কোথাও আছে। এখন আমি পাঠক এই নেই পিঁড়ির সরু আঁশফাটলের কারুকার্য দেখে বিভোর হবো কিনা সেটা সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের বিষয়। পীযূষ ভট্টাচার্য বলেন আমার লেখা যে গড়পরতা পাঠক পড়ে না এটা আমার কাছে প্লাস পয়েন্ট। আমার একটা পাঠকের ওয়েটেজ অনেক বেশি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটাদাতার মতো।

পীযূষদার একটা মিথ্যার জগৎ আছে। আমার মনে হয় সেটা তার নিজস্ব এন্টারটেইনমেন্টের জায়গা। মায়াময় নিষ্ঠুরতার জায়গা। দশতলার ফ্ল্যাটের জানালা থেকে নিচের বস্তির খোলা ছাদ বাথরুমের দিকে তাকালে যেমন মনে হয়। দূরত্ব আছে অথচ আন্তরিক। সেই জগতের রজনীকান্ত আছে অমিতাভ বচ্চন আছে ডাব্লু ডাব্লু এফের কুস্তি আছে। যে লোকটা 'সূর্য যখন মেষরাশিতে' লিখছে সে কেমন করে কলম বাগিয়ে ধরে টিভির ঘরে চলে আসে আর বিকট দক্ষিণী সিনেমার নায়কদের উৎসাহ দিয়ে 'মার মার শালাকে' বলে চেঁচাতে পারে সেটা রহস্য। লেখকের আর পাঠকের গোলমেলে সমীকরণ।

একবার একটা গল্প লিখে পীযূষ ভট্টাচার্যের কাছে গিয়েছিলাম। পড়ে চুপ করে থাকলেন। বললাম, বলুন কিছু দাদা। কেমন হলো লেখাটা? পীযূষদা তার কলমসিদ্ধ স্টাইলে কালি না চোঁয়ানো ভঙ্গিতে বললেন—মনে হিংসা না এলে তুমি লেখক নও। সেটা উপভোগ করছি। তাই কেউ পীযূষদার সামনে গল্প পড়ার পর উনি যদি হড়বড় করে গাদা গাদা প্রশংসা করে তাকে ভরিয়ে দিতে থাকেন তবে বুঝবে পীযূষদা সেফ জোনের স্বস্তিতে আছেন। এখনও কি ইনস্টিংক্ট!

লেখক পীযূষ তাঁর দুর্বোধ্যতা নিয়েও আমার কাছে প্রেডিক্টেবল্ কিন্তু পাঠক পীযূষ আজও দুর্বোধ্য, যেখানে তাঁর জীবনীশক্তি আছে।

পীযূষদা এক দরজাখোলা নদী

সন্দীপন নন্দী

কী বলা যায়? ব্যতিক্রমী বিশ্বের অলীক মানুষ। শব্দের সীমানা ছাড়িয়ে শব্দ শোনার দায়বদ্ধ পুরুষ! তিনিই বলতে পারেন "গল্পের প্রয়োজনে অন্ধকারের আশ্রয় নিতে হচ্ছে বলে মাফ করবেন"। মানুষের সভ্যতার দাবী বোধহয় এমনই। কালীঘাটের গঙ্গাস্নান নয়, তাঁর কলমে আত্রেয়ী পুনর্ভবারা সত্যিকারের নদী হয়ে ওঠে। তাই তো অভিমানী দূরত্বে থেকেও তিনি ন্যারেটর হতে চাননি। বারবার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছেন দ্রষ্টা বা কথক হয়ে। নদী পুড়ে যাবার মত অ্যালেগরি প্রথম পীযূষদাই দেখিয়েছিলেন। সাথে কতটা জলে নদীকে নদী বলা যায় বা নদী গর্ভবতী হলে বন্যা হয়, এই নিরন্তর লিখন একসময় দুর্বোধ্য থেকে অন্যধারার আশ্রয়স্থল খুঁজে নিয়েছিল সকলের কাছে। জীবনবোধ সম্পর্কে প্রতিনিয়ত স্পষ্ট ধারণার সার্চলাইট বিলিয়ে গেছেন অর্ধেক বয়সী বন্ধুদের। মৃত্যুকে বোঝা যায় না, মেনে নিতে হয়, বলতে পারেন কীর্তিমুখের স্রষ্টা পীযূষ ভট্টাচার্য। জীবনের সত্তর বসন্ত পার করেও তাঁর কলম-পর্ণমোচী বৃক্ষের পাতা ঝরলেই পরিযায়ী পাখিরা নড়ে ওঠে - বলতে পারে। আমার পৃথিবীর আলো দেখার সর্বমোট বয়সের সাথে একমাত্র সাদৃশ্য আছে এই মানুষটির লিখনকালের। তবুও আমাদের কাছে সাহিত্যের পিতৃপুরুষ এই মানুষটির কাছ থেকে শিখেছি লেখায় যৌথ বলে কিছু নেই। লেখা ফিঙ্গার প্রিন্টের মত। মিলতে মিলতেও মেলে না। তাইতো পীযূষদার মত মহিরুহ মানুষটি কীভাবে যেন পিতামহ ইমেজ ছেড়ে দাদার মত হয়ে গেছেন। বার্ধক্যের বারাণসীতে আগুন জ্বালিয়ে অমর একুশ, তরুণ তিরিশেই তাঁর যাতায়াত। তাই একযুগ পর আবিষ্কার করলেন ঘরের পাশে বয়ে চলা আত্মীয়েরা এখনও তাঁর মনের পাহারা দেয়। ঠাকুমার তালপাখায় আবিষ্কার করেন এক বিস্ময়কর নদী। এটাই পীযূষদা। সাহিত্যের মকবুল। গল্পের সিরিজেও মিশিয়ে দেন রঙের মিথ। গভীর রাতে বেহুলার ভেলা ভেবে বালিশে নড়ে ওঠেন। স্বপ্নসম্ভবের ছিটেফোঁটা বৃষ্টিতেই লিখে ফেলতে পারেন জ্যোৎস্নালোকের হুইল চেয়ার। একজন পুরুষ দোলন নামের মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে স্থবির হয়ে গেছেন। ভাবনার গণ্ডী মহাকাশ পাড়ি দিলেই এ সম্ভব! অনেকের অনেক বলার মাঝেও আমার, আমাদের 'কাছের মানুষ' বলে ওঠেন 'নারীকে ধর্ষণ করার চেয়ে খুন করা ভাল'। তাঁকে যদ্দুর চিনি, বুঝতে পারি তাঁর ৭০ বছরের জীবনে কখনও আপস করতে হয়নি। হয়তো তাঁর কোন কোন লেখায় অনমনীয় ভঙ্গিতে যুক্তির চেয়ে একরোখা বিশ্বাসই প্রকট হয়ে ওঠে। তবু এই আমাদের পীযূষদা, যাঁকে নিয়ে বিকল্প সাহিত্যধারার পক্ষপাতী জনেরা গর্ব করতে পারেন। হ্যাঁ দুষ্প্রাপ্য জীবন তাঁর। নইলে এমন কঠিন কৃচ্ছ্রের বৃত্তে নিজেকে নিরন্তর সমর্পিত রাখার মত দুঃসাহস দেখাতে পারতেন না। তাইতো বারবার জীবনের পরিপূরক পাঠকৃতি খুঁজে বেড়িয়েছেন। নিজেকে অনবরত বিনির্মাণ করে গেছেন! তাই বারবার পীযূষদা কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকতে চেয়েছেন। চেয়েছেন, পাঠক আলো ফোটার অপেক্ষায় না থেকে কুয়াশা ভেদ করে নির্ণয় করুক তার অনুভূতি। কাছে গিয়ে বুঝতে পারি যার কাছে সব ভাবনা সমীপেষু করা যায়। অনেকটা নদীর মত। যে নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

আত্রেয়ীর তীর ধরে ফেরা বাচকের ভূমিকায়

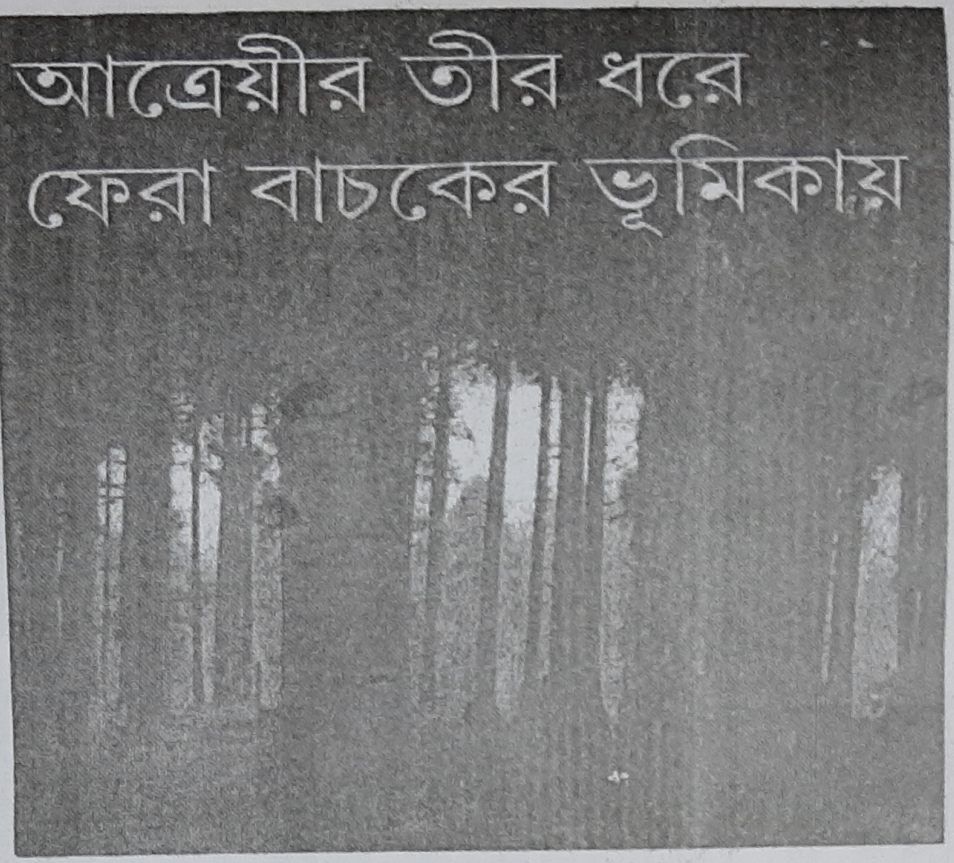

এখানে দেবতারাও পাঁচ বোন। মাঝ রাতে বিরাট এক ভূমিতে, মাথার উপর নক্ষত্রের শামিয়ানা। তারই নীচে পাঁচ বোনে কড়ি নিয়ে উপুর-চিৎ খেলেন। নির্জন রাতে রাস্তায় হেঁটে গেলে যেহাত্যভাবে, সত্তার জঠরে গড়ে ওঠে এক মহাশূন্যতা। লিখছেন: পীযূষ ভট্টাচার্য।

দূরে অবস্থিত কোনও রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া অপেক্ষা তোমার জলে মৎস্য কিংবা কচ্ছপ হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলে প্রাচীন কবির 'হে মাতঃ আত্রাই'-এর কাছে নিবেদন যেন 'মধুবনী' নকশা হয়ে ওঠে। অসম্ভব, অলীক, প্রগলভ শোনাতে পারে তবুও নদীতে পদ্ম ফুটে জীবনের প্রতীক হয়ে উঠুক, এ প্রতিদিনের প্রার্থনা। নদীর মাছ বা কচ্ছপের আর্কেটাইপের মধ্য দিয়ে বাঁচতে চাওয়া কি খুব বেশি চাওয়া? চাওয়া যেতেই পারে মধুবনীর সমস্ত নকশাটির পরিপূর্ণতা।

নদী তো ১৭৭৭-এর বন্যায়, ১৮৯৭-এর ভূমিকম্পে জরাগ্রস্ত-জরতী নদী এখন বুকে হেঁটে চলে। তথাপি ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে জন্ম নেওয়ার জন্য আশ্রয় নিয়েছিল তীরবর্তী শহর বালুরঘাটে। বালুরঘাট মামাবাড়ি। কলকাতার চিৎপুরের ডি বাই এফ ব্রজকুমার শেঠ লেন থেকে দেশের বাড়ি রংপুর-নীলফামারি, সেও এক উত্তরবঙ্গে, চলে আসতে হয়েছিল। সেখান থেকে বালুরঘাট। কলকাতার বাইলেনের স্মৃতি খুব একটা সুখের নয়— সেখানেই প্রথম মৃত্যু দেখা। আলতা রাঙানো লাল টুকটুকে দুটি পা নিয়ে রানির মতো চলে গিয়েছিল সরস্বতীদি, খেলার সাথী। অঙ্কের চৌকাঠে দাঁড়ানো কানুদার ঘরে সব সময় জ্বলত সবুজ আলো। তাকে বলে যেতে হয়েছিল কী কী ঘটছে এখন। বাচকের এই রকম ভূমিকা থেকে হঠাৎ চলে যাওয়া নীলফামারিতে। সে এক অন্য দেশ, তামাক পাতার উপর জল-শিশিরের আয়নাতে মুখ দেখা, নাম লিখে রাখা। বেলা বাড়লেই বাষ্প হয়ে লোপাট বর্ণমালা। আকাশে মেঘের ভিতর সে বর্ণমালার অন্বেষণ এক বিপত্তির কাল গেছে। সে আকাশ কলকাতার আকাশ নয়, লম্বা, চৌকো, নানান কিসিমের ফ্রেম বাঁধানো। বিরাট আকাশ, খোলা। খুঁজে না পেয়েই তখনই বুঝি তৈরি হয়েছিল এক সংকট, তার পরিণতি বুঝি এমনই হওয়া যৌক্তিক আজ।

তাই বুঝে নিচ্ছি মাটিতে দাঁড়িয়ে একমুঠো ধুলো শুঁকে বৌদ্ধচৈত্য ছিল কোনও এক দিন এখানে। প্রত্যাশায় থাকতে হয় এই বুঝি ভিক্ষুণী মেখলা এসে শুনিয়ে যাবে 'সঙ্ঘম শরণম গচ্ছামি'। মৌর্য, সুঙ্গ, গুপ্ত, পাল ও মুসলিম, পাঁচ-পাঁচটি যুগের স্তরের উপর দাঁড়িয়ে পুনর্ভবার তীরবর্তী এক এক সময় এখনই বর্তমান হয়ে ওঠে পাঁচটি যুগের জনপদ, রাজ্যপাট, যুদ্ধ, ধর্মের বিভিন্ন উপচারের পুনরাভিনয় হয়ে যায় চকিতে, পাঁচটি সভ্যতার উত্তরাধিকারও যেন পেয়ে যাওয়া। সে এ সব ছেড়ে চলে যায়— সে যায়। সে শুনতে পায় না কৈবর্ত বিদ্রোহের হুংকার— পরাজিত বখতিয়ারের অশ্বখুরের ধ্বনির মিলিয়ে যাওয়া। দেখতে পায় না সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মজনুশাহর তরবারিতে জ্যোৎস্নার হিরন্ময়।

একটা মানুষ একটা জীবন কাটাতে পারে তুলসী গাছ নিয়ে, আর আমার তো তিন তিনটে নদী— আত্রাই, পুনর্ভবা, টাঙ্গন। আর তিন নদী এক বেণি বেঁধে নদী হয়ে গেছে কখন জানি না, তবে বেঁচে আছি। ৫৮ সাল থেকেই। চলে যাওয়া যেমন আছে, মজে যাওয়াও আছে। নতুন শিলাখণ্ডের লিপি উদ্ধারের তথ্যতার দায় দিয়ে কাটিয়ে দিলেন কেউ একটা জীবন। এ থাকা অন্য ভাবে থাকা। মায়াবী হাতছানি এড়িয়ে সমসময়ের ইশারা উপেক্ষা করে থাকা। একটা সময় ছিল উত্তর-দক্ষিণ দুই বঙ্গের মানুষের কাছে ছুটে যাওয়ার ব্রত। আশির দশকে এসে বাইরের ছোটাছুটি বন্ধ হলেও ভিতরে ভিতরে নিরন্তর ছোটাছুটি চলতে শুরু করে দেয়। তখনই গদ্য লেখার শুরু। এখন তো ইন্টারনেটের দৌলতে সারা পৃথিবী জুড়েই বাস। তাঁরা ভারতবর্ষের কয়েকটি শহরের নাম জানেন, তার মধ্যে কলকাতা। উত্তরবঙ্গ বোঝেন না, আমি বলি পশ্চিমবঙ্গে থাকি। আমার জানা এমনও মানুষ আছেন ইতিহাসের মিসিং লিঙ্ক খুঁজবার জন্য ভারতবর্ষ চষে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা বলেন ভারতবর্ষে থাকি। চাকরি বা পরিস্থিতি বাধ্য না করলে যাব কেন? এ গেঁয়ো স্বভাব বা গোঁয়ার্তুমি নয়, যুক্তি।

আত্রাইয়ের মেঘ গলিত ধাতুর মতো সগর্জন নেমে প্রতিমা ছাঁচে পড়ে স্বর্ণমূর্তি হয়ে যায় হেমন্ত। পর্ণমোচী বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়াতেই মনে হয়, পরিযায়ী পাখিদের আসবার সময় হয়ে গেছে। এমন এমন গ্রাম আছে যেখানে প্রতিটি গৃহেই পাওয়া যাবে দোতারা। রাস্তার দু'ধারে চলতে চলতে ইচ্ছার পতাকা ন্যাকরাকালী বা পিরের বৃক্ষে লটকে দিতে পারি। আমাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ 'হালুয়া' বলে 'হালুয়ানি' শোনে। মুখোশ পড়া জোড়াকলম মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে জানাতে অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে মুদ্রা শালার মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে ঝিমুতে থাকে। দুঃখের কাহন আর কত? তখনই নিজের ভিতর আত্মবাঁশি আর্তনাদ করে ওঠে, প্রতিবাদ কোথায়? কোনও কোনও প্রতিবাদ আত্মপ্রতিষ্ঠার নামান্তর মাত্র, জানি। কিন্তু এত দিনে খাঁপুরের তেভাগার শহিদ যশোদারানি যশোদা মা হয়ে গেছেন। সময়ে তো এ ভাবেই হয়। তবে কি আমরা নিয়ন্ত্রণরেখার বাইরে?

লেখাও এ ভাবেই হয়। এ ভাবেই পৌঁছতে চাই শিকড়ে। সব জীবনই তো দুঃখের। ভালবাসাও দুঃখেরই। বলা যেতে পারে এ সত্যিকারের বেঁচে থাকার দুঃখ। পরজন্ম নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। কেননা এ জন্মেই তো বার বার করে জন্ম নিতে হচ্ছে। এ জন্ম নেওয়ার মধ্যে আছে যতটা তেজ তার চেয়ে বেশি কষ্ট। তার জন্যই শব্দের সীমানা ছাড়িয়ে শব্দ শোনানোর দায় থেকে গেছে জীবনে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রমূলে আঁকড়ে থাকাটা কষ্টের বই কী। এর জন্য আঁকড়ে থাকার কৌশল বার করতে হয়। এ এক অদ্ভুত ব্রতচারণ, কেননা ব্রতাচারের উদ্দেশ্যই তো মানুষে পরিণত হওয়া।

এখানে দেবতারাও পাঁচ বোন। মাঝ রাতে বিরাট এক ভূমিতে, মাথার উপর নক্ষত্রের শামিয়ানা। তারই নীচে পাঁচ বোনে কড়ি নিয়ে উপুর-চিৎ খেলেন। নির্জন রাতে রাস্তায় হেঁটে গেলে যেহাত্যভাবে, সত্তার জঠরে গড়ে ওঠে এক মহাশূন্যতা। মাথার উপর মহাজাগতিক বিস্ফোরণ, সৃষ্টির বিগ-ব্যাং। তারই প্রতিধ্বনি শুনবার জন্য কুম্ভকর্ণ হয়ে আছি। এই কি সেই কুহক। যার টানে এক কোজাগরে যেখানে আত্রাই নিজেকে সরিয়ে একটু প্রতিবাদী সাহসী খাঁড়ি হয়ে চলে গেছে, সেখানে প্যারিটি ব্রিজ। এই সব পেরিয়ে চলে গিয়েছিলাম মূল আত্রাইয়ের কূল ধেয়ে বহুদূর— তখন বয়সই বা কত? পাঁচ-ছয় হবে। মামাবাড়ি থেকে মাঝরাত অবধি খুঁজে পেয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ধান্দুর্বা দিয়ে বরণ করে ঘরে তুলেছিল। নদী যে আমাকে ফিরতে দিয়েছে তার জন্যই কি উপচারের আয়োজন ছিল সে দিন?

পুনর্ভবায় এখনও তো কার্তিকের রাতে ঘট ভরে সরষের তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসানো হয় সন্তানের আকাঙ্ক্ষায়। কেন সে পুরুষ পার্বতীর নৃত্যের নিক্কণ বর চেয়েছিল দক্ষরাজার কাছে, সেই টক্কণ তুলে নেমে আসাই তো আজকের টাঙন।

আত্রাইয়ের নাব্যতা ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আছি। ময়ূরপঙ্খি নৌকা ভেসে যাবে। নদীর প্রতিটি বাঁকের ঘূর্ণির প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্য মাঝিরা মশানকালী বা সত্যপিরের গান গেয়ে উঠবে। নদীপথের পাশে থাকুক না আধুনিক রাস্তা। ছুটে যাক সভ্যতার দ্রুততম যান। অসম্ভব এক মেলবন্ধনের কথা ভাবি সব সময়। এই তো সে দিন ধনঞ্জয় রায় মাঝরাতে টেলিফোনে জানাল, সে নাকি আত্রাইয়ের লুপ্তপ্রাচীন পাঁচালি উদ্ধার করেছে। বাড়ি বয়ে শুনিয়ে যাবে এক দিন। সে দিনই ঘটবে আরও এক বার আমার জন্ম। আত্রাইয়ের ব্রত আখ্যানের মধ্য দিয়ে।

সত্যি আমি কি সেই অপেক্ষায়? তবে কেন বার বার এসে দাঁড়াচ্ছি আত্রাইয়ের তীরে? মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে? মুগ্ধতার গভীরে ডুবে যেতে চাই বলে এই আসা? যেমন দৈত্য, আত্রাইয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে পথ ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল নদীকে। আত্রাই তো পতিতোদ্ধারিণী সর্বসন্তাপহারিণী পুণ্যতোয়া। গঙ্গা তখন আত্রাইকে উদ্ধার ও দৈত্যনিধনের জন্য তিন দেবদূত পাঠালেন। দৈত্যনিধন শেষে আত্রাই উদ্ধার হল কই? তিন দেবদূতই প্রেমে পড়ে গেলেন। মুগ্ধ হয়ে আত্রাইকে স্পর্শ করতেই মুহূর্তে তারা তিন জন ফুলবৃক্ষ। ফুল দিয়ে আজীবন পুজো করে যেতে হবে এ রকম অভিশাপের কথাই কথিত। ও ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে উর্মি দু'বাহুতে পাতার উপচার ঘটে। কলি থেকে ফুল ফুটে ঝরে যায় নদীতে। রাত্রির ফুল। ভোর হলেই পরিচিত ফুলের গন্ধে বুঝি আমরা আছি। ছিলাম। এ ভাবেই থেকে যেতে হয় আমাদের। ফিরে আসতে হয় বাচকের ভূমিকায়। যার শুরু সবুজ আলোর ভিতর অন্ধকে শোনাবার জন্য।

ছবি: সন্দীপ পাল।

পীযূষ ভট্টাচার্য : পুরস্কার প্রাপকের অভিভাষণ

এই সম্মাননা কথাসাহিত্যের জন্য, তথাপি শুরু করতে বাধ্য হচ্ছি কবিতা দিয়ে। গদ্য লিখবার প্রয়াসের আগে প্রায় একদশক কবিতা লিখেছি, 'মহিম্ন অসুখ মহিম্ন যন্ত্রণা' থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ না করলে মনে হয় অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। কার্যত উচ্চারণ না করেও আমার উপায় নেই—এ একধরনের বাধ্যবাধকতা যেন! কেননা নিজেই খুউব একটা ভালো নেই এখন—

কবিতাটি এমন ছিল—

দিনগুলি
আইবুড়ো মেয়ের
সোহাগী বেড়ালের মতো
কেটে যায়।
আমার ভায়ের রক্ত
আমার সাথে কথা বলে
আমি ঘুমিয়ে থাকি।
বাসি মৃতদেহ ঘিরে
মাছিদের গুঞ্জরণ
রক্তময় শরীরে আমি
মৃত...

রক্তময় শরীরে কেন মৃতবৎ থেকে যাওয়া? এই প্রশ্নে সেদিনও যেমন তাড়িত ছিলাম আজ সমানভাবে তাড়িত। এই তাড়নাতেই আটের দশকের শুরুতে কথাসাহিত্যে চলে আসা এবং অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে প্রায় ত্রিশবছর পার করে দিয়েছি কখন বুঝতেই পারিনি। আদতে, কথাকার হতে চেয়েও হয়ে উঠেছি এক আর্তমানুষ— লেখাগুলি শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজেকেই জানতে চাওয়া।

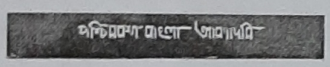

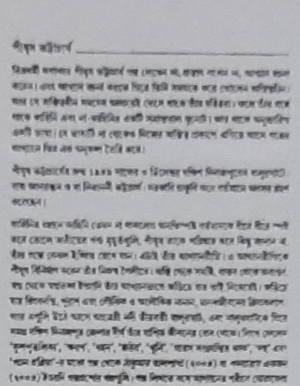

সেহেতু, লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে বাস্তব ঘটনার চেয়ে তারই প্রতিক্রিয়া বেশি। কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত উঠে না এসে তার পরিবর্তে এসেছে উৎকণ্ঠা এবং তা থেকে মুক্তি পাবার প্রয়াস মাত্র। সবমিলিয়ে হয়ে উঠেছে এক দুঃসহ জগতের খোঁজখবর। হেরে যাওয়া মানুষের অসহায়তা সোচ্চার ভাবে উপস্থিত করতে পারিনি, এমনকি খুউব একটা প্রতিবাদী রূপও দিতে পারিনি তার। আসলে আমি চেয়েছি বহমান জীবনকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে, তা থেকে উৎসারিত মানুষের নিজস্ব অস্তিত্বকে মানুষই খুঁজে নিক।

আসলে কবিতার প্রশ্নটি নিয়ে যখন গদ্যে উপস্থিত হলাম উত্তরের আকাঙ্ক্ষায় কিন্তু কখন যে এক বিরল প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছি বুঝতেই পারিনি। এই চলার পথে অন্তরীক্ষে জলেস্থলে কোনো অবরোধই ছিল না, যেন পিশাচসিদ্ধ সময় গিলে খেয়েছে সময়কেই। সেখানে কেবলমাত্র একক বিন্দুর মতন দাঁড়িয়ে আছে একটি বৃক্ষ। চিরহরিৎ বৃক্ষের ঘনছায়ার ভিতরেই যেন লুকিয়ে আছে প্রশ্নের উত্তর, এরকমই মনে হয়েছিল সেদিন। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়েছিল এক অশ্বমেধ ঘোড়া। ইচ্ছে ছিল ঘোড়ার কাছ থেকে উত্তর জেনে নিই, কিন্তু তার তো সময় নেই— বিশ্বজয় করতে একছুটে হাওয়া। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সেই ছায়ার ভেতরেই আছি অপেক্ষায়, যদি ঘোড়া ফিরে আসে শ্রান্ত হয়ে, তখন অনেক সহজ হবে উত্তর জেনে নেওয়া— কেন-না উভয়েই এখন প্রৌঢ়ত্বে।

আসলে ওটি ছিল রাজসূয় যজ্ঞের ঘোড়া, আমার দেখা না পাবারই কথা। আবার এও হতে পারে এসব নিছক কল্পনা মাত্র। কেন-না মানুষের সাধারণ বাস্তব থেকে মিথ্যা আত্মবিস্মৃতিপরায়ণতা ও যথাযথ মিথ্যাকে সত্যের অনেক বেশি নিকটতম বলে মনে হয়। কেননা পক্ষীরাজ ঘোড়ার যে অস্তিত্ব নেই জানা থাকা সত্ত্বেও মেনে নিতে কষ্ট হয়। অর্থাৎ যেন সৃষ্টির মূল কথাটাই লুকিয়ে আছে বিভ্রম সৃষ্টির মধ্যে।

অথচ এতদিনে সেই বিরানভূমিতে তৈরি হয়ে গেছে এক জনপদ। মৃত ও জীবিতদের একই সঙ্গে বসবাস সেখানে। এই জনপদে যাঁরাই থাকতে আসেন তাঁরাই সঙ্গে নিয়ে আসেন তাঁদের ইতিহাস সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা, তাঁদের লোককথা, মিথ, এমনকি তাঁদের টোটেমদেরও। সেখানে মন্ত্রপূত মাদি মোষ তাড়া করে বেড়ায় নির্দিষ্ট এক পরিবারকে, তাঁরা নিজের ছায়া দেখলেই ভাবেন এই বুঝি মাদিমেষ দাঁড়িয়ে আছে। নির্জন দুপুরে পাঁচিলে পোঁতা কাঁচমুখ বাঁচিয়ে বেড়ালের রাজকীয় চলাচল। সেখানে মকবুল গাজির পোষা কুকুর পূর্ণচাঁদ উঠলেই ডেকে ওঠে ঊর্ধ্বপানে। যেন মনে করিয়ে দেয় কনভারটেড এই মুসলিম পরিবারটি আগে ছিল বারেন্দ্রব্রাহ্মণ। ঘোড়ায় বসে থাকা ছিন্নমস্তকে সাওয়ারি দেখলেই বুঝতে পারি ইসমাইল গাজি চললেন কবরের খোঁজে। এখানে কেবল মহাবিষুব সংক্রান্তিতেই কাক ডাকে। যদি কখনও সবুজ টিয়া ডাকে তখন বুঝতে হবে— পৃথিবীর কোথাও না কোথাও জাতি দাঙ্গা হচ্ছে।

এই সৃষ্ট চরিত্ররা প্রশ্ন করে ধর্মের মধ্যে হিংসার কেন এত উপস্থিতি? এত হিংসা বোধ থাকলে ধর্মের তবে প্রয়োজন নেই। এরা বিজ্ঞানকেও প্রশ্ন করে ধ্বংসের জন্য, বিজ্ঞানের উন্নতির প্রয়োজন আছে কি? কেননা এরা জানেনা অ্যাসিড বাল্‌ব ছুঁড়ে প্রেমিকার মুখকে বীভৎস করে দিতে।

আসলে আমরই সৃষ্ট চরিত্ররা আমারই মতন অন্ত্যেবাসী। আত্রেয়ী-পুনর্ভবা-টাঙ্গন-এর তীরবর্তী বাসিন্দা। প্রাচীন এই তিন নদী পুরাণ বর্ণিত কাহিনি নিয়েও না মরে বেঁচে আছে এখন। এ বেঁচে থাকা নির্দিষ্ট একটা ঋতুর জন্য, বর্ষা কখন আসবে? এরাও অনেকের মতন দেশভাগ মেনে নিতে পারেনি। কেননা যে সামান্য অংশ এ দেশের ভাগে পড়েছে সেখানে যদি তিস্তা প্রকল্পে জল প্রবাহিত হলে অন্য রাষ্ট্রের সুবিধে হবে, তাই এদের জন্য আগাম মৃত্যুঘোষণা। এই সব অভিমানী নদীর কথা বলতে গেলেই ভীষণ অসহায় হয়ে পড়ি, কেবলই মনে হয় মৃতের জন্য কোনো ভাষাই তৈরি হয়নি এখনও।

এই বিরানভূমির বাসিন্দারা সকলেই আমার নিকট আত্মীয়— তাঁরা যখন এই জনপদ ছেড়ে চলে যান তাদেরকে সহজেই চিনতে পারি তাদের টোটেমের ব্যবহারে। বাড়িতে তারা যে কোনো জাতের কুকুর পুষুক না কেন বুঝে যাই তারা তাদের টোটেমকেই ব্যবহার করছেন। গলায় বা আংটিতে মিনিয়েচার ফর্মে মহিষ বা বেড়ালের মাথা অলংকারে চোখ দুটি অন্ধকারে জ্বলজ্বল দুর্লভ খনিজ পাথরের দৌলতে। তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না চরম আধুনিকতার মধ্যে থেকেও কেউ আধুনিক নয়— টোটেম সিম্বলই প্রমাণ। এসবও লেখায় থাকে।

এ প্রসঙ্গ উপস্থাপনার অর্থ হচ্ছে, আমার বেশিরভাগ সূত্রই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তরের লোককথা, বিভিন্ন জনজাতির লোকশ্রুতি, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, পরিচিত-অপরিচিত এমনকি আঞ্চলিক মিথ, আঞ্চলিক ইতিহাস ইত্যাদি থেকে। এই Oral tradition-এর মধ্যে ঢুকে গেছে সামাজিক, রাজনৈতিক ইস্যুগুলির বিস্তার। Oral tradition-কে কথাসাহিত্যে এই রূপান্তর ঘটানোটি কতখানি যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে জাতীয়তাবাদী পাঠক সমাজের মধ্যে প্রশ্ন থাকতে পারে। তথাপি যাদের মধ্যে আমার এই প্রচেষ্টা আনুকূল্য পেয়েছে বা পাচ্ছে তার রাজনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম।

এই প্রসঙ্গে The Communist Manifesto-র ন্যারেটিভের অবতারণা করছি সবিনয়ে। কেননা আমরা জানি উপযুক্ত কথনভঙ্গি ও প্রকরণে যদি কোনো কাহিনিকে তুলে ধরা যায় তার আবেদন বৃদ্ধি পায় বহুগুণ এবং দীর্ঘায়িত হয় জীবৎকাল।

The Communsit Menifesto'র শৈলির প্রসঙ্গে উমবের্তো একো বলেছিলেন— এতে আমরা পাচ্ছি Romantic flowering of Gothic novel, a foundation epic, Genesis এর কাহিনি এবং একটি dramatic reversal. আমরা বিশ্বাস করি বা না করি এরকম একটি আদ্যন্ত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আইডিয়ার এগুলি থাকার জন্যই অভিঘাত তৈরি করে চলছে আজও।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বলি সভ্যতার ইতিহাসে বহু কাহিনির সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু কী ধরনের প্রেক্ষিতে কী ধরনের ঘটনা বা অভিজ্ঞতা একটি সার্থক কাহিনি তৈরি হয় তার কিন্তু কতকগুলো নির্দিষ্ট প্যাটার্ন লক্ষ্য করা গিয়েছে যা আর্কি-টাইপাল ন্যারেটিভ বা কাহিনির আদি উৎস। তার মধ্যে ইতিহাস জুড়ে যায়, জনজীবনের উত্থান-পতন মিলেঝুলে তৈরি করতে থাকে নানান উপকথা, মিথ। এগুলিই ইতিহাসের সাংকেতিক বীজ, ভবিষ্যৎ-এর ডিকনস্ট্রাকশনের অপেক্ষায় সুপ্ত থাকে। আমার একমাত্র কাজ বীজকে অঙ্কুরিত করে বৃক্ষে পরিণত করবার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া।

কথাসাহিত্যের মধ্যে বিশেষ করে ছোটোগল্প প্রসঙ্গে যে কথাগুলো উচ্চারণ করলাম তা কিন্তু আমার উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। যদিও উপন্যাস ও উপন্যাসিকা সবমিলিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে মাত্র দুটি। অন্যগুলি প্রকাশের অপেক্ষায়— গ্রন্থাকারে প্রকাশে কেন দেরি হচ্ছে এ প্রসঙ্গ অবতারণা করা এখানে অনুচিত হবে। তবে, যে কথা বলা যেতেই পারে মূলত আমি লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। সেখানে উপন্যাসে যে পরিসর প্রয়োজন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একধরনের সীমাবদ্ধতা তৈরি হওয়ার জন্য একটি উপন্যাসকে ভেঙে ভেঙে নভেলেটের আকারে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ করা হয়ে থাকে, অনেক সময় গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় জুড়ে দেওয়া হয়। সেরকম উপন্যাসে, *নিরুদ্দেশে উপকথা, উৎসর্গে উপকথা, তালপাতার ঠাকুমা* গ্রন্থাকারের অপেক্ষায়।

সূর্য যখন মেষ রাশিতে যা প্রায় পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় প্রকাশিত এবারে একটি শারদীয়া দৈনিকে যদিও সেটিও গ্রন্থাকারের অপেক্ষাতে আছে তা সেখানেও দেশভাগ পরবর্তী সময়ে ওপারে থেকে যাওয়া মানুষের অসহায়তা, দাঙ্গা নেই অথচ মানুষিকভাবে দাঙ্গা তাড়া করে বেড়াচ্ছে, সবকিছু ফেলে মানুষ পালাচ্ছে— রক্তপাতহীন এই দাঙ্গা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যোগাড় করতে হয়, মিথ্যা ডেথ সার্টিফিকেট, না হলে নিজের সন্তানের কাছে পৌঁছানো যাবে না এবং যারা বিশ্বাস করে আশমানের নীচে পৃথিবীতে যত বাসযোগ্য জমিন আছে সেখানে মানুষের বসবাসের অধিকারের কথা, তারাও অসহায়, ক্যানেস্তারার টিন পিটিয়ে ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে যেখানেই যাবে সেখানেও প্রতিটি পদধ্বনিতে ফুটে উঠবে অসহায়ত্ব। আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিতে স্নান করে নিলে মনে হয় আপাতত মুক্তি। এর ফলে মুক্তি ঘটে না জানা সত্ত্বেও প্রতিবছর এই দিনটির অপেক্ষায় থাকে, এই ভাবেই বাঁচে।

কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত *জীবিসঞ্চার* ও *নিরক্ষরেখার বাইরে* উপন্যাস দুটি এত বেশি আলোচিত সে প্রসঙ্গে কিছু না বলাই ভালো। *জীবিসঞ্চার*-এ নাথসাহিত্যের গুপীচন্দ্র নবজন্ম নিয়ে উপস্থিত পৃথিবীর ক্লেদ মুছে ফেলার জন্য। অন্যের আয়ু চুরি করে ক্ষমতালোভীর দীর্ঘায়ু হবার আকাঙ্ক্ষা বানচাল হয়ে শিল্পবাস্তবতার বহুস্তরের অভিজ্ঞতা একে অন্যকে জড়িয়ে রাজনৈতিক ও ধর্মের বৃত্তে আবদ্ধ মানবিকতার সংকটের আখ্যান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিরক্ষরেখার বাইরে সেই সংকটই অধিকতর স্পষ্ট। এখানে যার আরোগ্যের জন্য মরুভূমি থেকে কোরবানির উট এসে দাঁড়ালে আরোগ্যের পরিবর্তে সে জাতি দাঙ্গায় নিহত হয়ে যায় সমতলে কোরবানির উট স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে একসময়। মৃত্যু মুহূর্তে পৌঁছলেই জীবন জীবনের মতন হয়ে যায়। তখন আর কল্পিত রেখার বাইরে থাকা মানুষজনের সেই রেখাকে অতিক্রম করে চলে যাওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। আদতে তারা উপায়হীন-অসহায়।

যে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরে যেতে হচ্ছে কেননা আমার জন্মের কিছুদিন আগেই বালুরঘাট থেকে কয়েকমাইল দূরে খাঁপুরের তেভাগা কৃষক আন্দোলনে বাইশজন শহিদ হয়েছেন। যেহেতু শীতের মাঝরাতে আমার জন্ম, যে খ্রিস্টান মিডওয়াইফ মামাবাড়িতে আমাকে জন্মাতে সাহায্য করতে এসেছিলেন তিনি সে রাতে বাড়ি ফিরে যাননি। তার একমাত্র কারণ মাঝরাতে তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে ২২ জন শহিদ লাশকাটা ঘর থেকে নিজস্ব গ্রামে ফিরে যান প্রতিদিন।

এ গল্প অবশ্য আমার আঁতুড়ঘরে বসেই বলা। এরপর অবশ্য আবার নীলফামারিতে ফিরে যাওয়া, তারপর সরাসরি উদ্‌বাস্তু হয়ে আমাকে আনা হয়েছিল কলকাতায়। বালুরঘাটে আনা হয়নি তার কারণ বালুরঘাট ছিল নোশানাল এরিয়া। হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানে যে কোনো দিকে যে কোনো সময় ঝুঁকে পড়তে পারে।

পাশপোর্ট চালু হবার পর ভারতীয় নাগরিক হয়ে মার সঙ্গে ফিরে যেতে হয়েছিল নীলফামারিতেই বাধ্য হয়ে। এবং আমরা ভারতীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও কতখানি পূর্বপাকিস্তানকে সমর্থন করি তা প্রমাণ করবার জন্যই উর্দু নিয়ে ভরতি করে দেওয়া হয় আমাকে। নীলফামারির সেই স্কুলে হিন্দু ছাত্ররা সংস্কৃত পড়ে [illegible]সলিম ছাত্ররা উর্দু। আমি ছিলাম একমাত্র ব্যতিক্রম। হাজারো [illegible] থাকা সত্ত্বেও আমার জন্য একজন মৌলভি গৃহশিক্ষক নি[illegible] হয়েছিল, তবুও শেষরক্ষা হয়নি। ৫৮তে পাকাপাকিভাবে [illegible] বালুরঘাটে চলে আসতে হয়। সেই থেকেই বালুরঘাটেই আ[illegible]র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে শহরটির নিজস্ব কুহক আবিষ্কারে[illegible] এই কুহক আবিষ্কার করতে না পারলে কী হত বলা মুশকিল। [illegible]জকে উদ্‌বাস্তু ভাবতাম তবে অন্যভাবে থিতু হতে চাইতাম, [illegible] উদ্‌বাস্তুর থিতু হয়ে অধিকার কায়েম করা ছাড়া অন্য [illegible] নেই। সেরকম কিছুই আমার মধ্যে ঘটেনি, অধিকারে[illegible] কোনোরকমই বিশ্বাস নেই। বরঞ্চ আঁতুড় ঘরে যে ক[illegible]াত— এত রক্তপাত কী বলতে চায় তা জানবার জন্যই [illegible]কা যেন।

এইভাবে বেঁ[illegible]াকার নানান দিক থেকে বিচার করতে গিয়ে মনে হয়েছে আত্রেয়ী নদী সম্পর্কে যে পৌরাণিক মিথটি আছে তা হচ্ছে সুন্দরী আত্রেয়ীকে এক লম্পট দৈত্য পথ ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তা দেখে গঙ্গা দৈত্য নিধনের জন্য দুজন দেবদূত পাঠান আত্রেয়ীকে উদ্ধারের জন্য। যুদ্ধে দৈত্য পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও বিজয়ী দেবদূতেরা অভিশপ্ত হয়ে যান— সুন্দরী আত্রেয়ীকে প্রেম নিবেদনের জন্য। দুজন দেবদূত আজও দাঁড়িয়ে আছে রাতের ফুলের সম্ভার পূর্ণ বৃক্ষ হয়ে। সকালে আত্রেয়ী জলে ভেসে চলছে রাতের ফুল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় অভিশপ্ত দেবদূত নিজেই একজন—অপরজন কে? সীমান্তের এপারে আছেন না ওপারে? অথবা আমারই সামনে আছেন তাকে আমি চিনি না, সেজন্য লেখাতে কোনো Post Colonian Pattern তৈরি না হয়ে কিছুটা অনির্দিষ্ট, জীবনানন্দের 'অপর আকাশে'র মতন অপর মানুষ হয়েই থাকেন ওঁরা।

উত্তরবঙ্গের নদীগুলি নেমে আসে নুড়িপাথর সঙ্গে করে, চলার গতিতে সে পাথর সমতলের উত্তরবঙ্গে পৌঁছোয় তখন কেবলই বালি, বালিতে মিশে থাকে অভ্রকণা, জ্যোৎস্না কিংবা অমানিশাতে প্রিয় নদীটির তীরে দাঁড়ালেই বুঝতে পারি চতুর্দিকে ঘটে চলছে অভ্রের বিচ্ছুরণ, অদ্ভুত মায়াময়। যদিও নদী এখন ঝরতি, তথাপি নদীর দহতে ডুব দিয়েছিল যে নারী নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সে কিন্তু ভেসে উঠে হয়ে যায় এক মৎস্যকন্যা। তার উন্মীলিত চোখের ভাষা পড়তে পারি বলেই তারই মতন আমি অসহায়। এই অসহায় মানুষগুলির পক্ষে দাঁড়ানোই হয়েছে আমার একমাত্র নিয়তি।

মূলত আমি লিটল ম্যাগাজিনের লেখক, সেহেতু যে সব লিটল ম্যাগাজিনে লিখে থাকি, আবার যে সব লিটল ম্যাগাজিনে এখনও লিখে ওঠা সম্ভব হয়নি তাদের সকলের কাছে তাদের পাঠকদের কাছে কৃতজ্ঞ। সেরকম সমানভাবে কৃতজ্ঞ অসম ও ত্রিপুরার বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের কাছে।

তবে, বালুরঘাট থেকে প্রকাশিত *প্রতিলিপি* পত্রিকার কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ, তাঁরাই আমাকে দিয়ে জীবনের প্রথম গল্পটি লিখিয়ে নিয়েছিলেন। তেমনই কলকাতার লিটল ম্যাগাজিন সমাজের পত্রিকা *একালের রক্তকরবী* ১৯৯৪ এ শারদসংখ্যায় একটি গল্প প্রকাশ করে কলকাতার লিটল ম্যাগাজিনের পাঠকের কাছে আমার লেখার পরিচয় ঘটান। যেমন কথাসাহিত্যের জন্য প্রথম সম্মাননা জানিয়েছিলেন *মধ্যবর্তী* পত্রিকা। তেমনই আমার যাট বছর পূর্তিতে গল্পবিশ্ব পত্রিকা আমারই লেখালেখি নিয়ে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রথম প্রকাশ করে ঋণী করে রেখেছেন।

এই মুহূর্তে স্মরণ করছি বাবা ও মাকে। বাবা, দীর্ঘ লড়াই করে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে স্বীকৃতি আদায় করতে পেরেছিলেন তিনিও একজন স্বাধীনতা সৈনিক। আর আমার মা, বিয়ের আগে যে প্রাইমারি স্কুলেরই শিক্ষিকা ছিলেন দেশভাগের অনেক পরে সেই স্কুলেই বালুরঘাটের কিছু শিক্ষা অনুরাগী মানুষের সহৃদয়তায় সেই চাকরি ফিরে পেয়েছিলেন। ততদিনে অবশ্য মাঝেমধ্যে না হোক একবেলা খাবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

বিশেষ করে আমার স্ত্রী মাধুরীসহ পারমিতা-সংঘমিত্রা দুই কন্যার অবদানের কথা স্বীকার করছি, তারা নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও একমুহূর্তের জন্য নীতিভ্রষ্ট হতে দেয়নি—লিখে যেতে সাহায্য করে গেছে।

এই অবসরে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, যাঁরা আমাকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করে চলছেন যথার্থ একজন কথাকার হতে।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিকে শান্তি সাহা স্মারক পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার। এতে কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে আমিই সম্মানিত হইনি; সম্মানিত হয়েছেন আমার সৃষ্ট চরিত্ররা এবং তাদের সহমর্মী পাঠককুল। ধন্যবাদ।

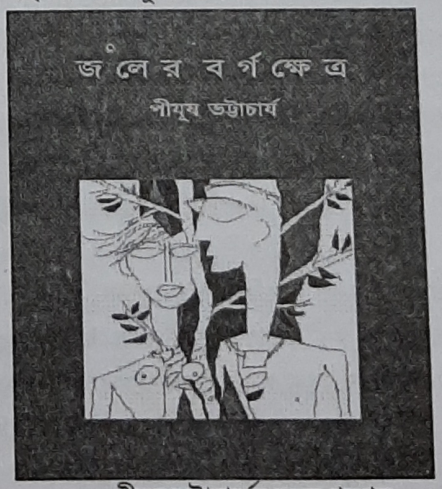

পীযূষ ভট্টাচার্যের নতুন গল্পগ্রন্থ—
'জলের বর্গক্ষেত্র'
সহজিয়া প্রকাশনী, মূল্য ২০০/

Published by : Bratin Sarkar, Printer : Sankar Press, Balurghat
Editor : Kaushik Ranjan Khan, Balurghat, Dakshin Dinajpur